ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে

হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আঁধার আঁধার! অসীম আঁধার!
আঁখি হয়ে যায় অন্ধ!
জাগো শিশু—রবি, আনো আলো—সোনা
আনো প্রভাতের ছন্দ!

হ্যাঁ, ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতের কথা বলব। প্রাগৈতিহাসিক কালে আর্যাবর্তে বিচরণ করতেন রঘু, কুরু, পাণ্ডব, যদু ও ইক্ষ্বকু প্রভৃতি বংশের মহা মহা বীররা। তাঁদের কেউ কেউ অবতার রূপে আজও পূজিত হন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকদের জগতে ভারতে প্রথম প্রভাত এনেছিলেন উত্তর—পশ্চিম ভারতবিজয়ী আলেকজান্ডার এবং গ্রিকবিজয়ী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত।

রাম—রাবণ ও কুরু—পাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনির মধ্যে অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক সত্য থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে তর্ক না তুলে আপাতত এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পুরাণবিখ্যাত সেই সব যুদ্ধের পরেও ভারতে এসেছিল দীর্ঘকাল ব্যাপী এক তমিস্রযুগ। তারই মধ্যে কেবল সত্যের সন্ধান দেয়—নিষ্কম্প দীপশিখার মতো বুদ্ধদেবের বিস্ময়কর অপূর্ব মূর্তি। আজ ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি, তখনও তার অস্তিত্ব ছিল না বটে, কিন্তু কী এদেশি, কী বিদেশি কোনও ঐতিহাসিকেরই এমন সাহস হয়নি যে বুদ্ধদেবকে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেন। সেই খ্রিস্টপূর্ব যুগে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস বলতে বুঝি, বুদ্ধদেবের জীবনচরিত।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এবং শিলালিপি প্রভৃতির দৌলতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী যুগের ভারতের কতকগুলি প্রমাণিক ছবি আমরা পেয়েছি। যদিও সে যুগের বৌদ্ধচিত্রশালা সম্পূর্ণ নয়, তবু আলো—আঁধারের ভিতর থেকে ভারতের যে মূর্তিখনি আমরা দেখতে পাই, বিচিত্র তা—মোহনীয়া!

তারপরই সেই ছায়ামায়াময় প্রাচীন আর্যাবর্তে সমুজ্জ্বল মশাল হাতে নিয়ে প্রবেশ করলেন দ্বিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার। যে শ্রেণির কাহিনিকে আজ আমরা ইতিহাস বলে গ্রাহ্য করি, তার জন্ম হয়েছিল সর্বপ্রথমে সেকালকার গ্রিক দেশেই। কাজেই আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান স্থানলাভ করল গ্রিক ইতিহাসেও এবং আলেকজান্ডারের পরেও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে গ্রিসের আদান—প্রদানের সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়নি। তাই সে যুগের ভারতবর্ষের অনেক কথাই আমরা জানতে পেরেছি। গ্রিক লেখকদের প্রসাদে। সেলিউকস প্রেরিত গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস লিপিবদ্ধ করে না রাখলে আমরা মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের যুগে মগধ সাম্রাজ্য তথা ভারতবর্ষের রাজপ্রাসাদ, রাজসভা, রাজধানী, সমাজনীতি, শাসননীতি, আচার—ব্যবহার প্রভৃতির অনেক কথাই জানতে পারতুম না। এজন্যে গ্রিসের কাছে ভারতবর্ষ হয়ে থাকবে চিরকৃতজ্ঞ।

প্রাকৃতিক জগতে যেমন কখনও মেঘ কখনও রোদের খেলা, কখনও আলো কখনও ছায়ার মেলা, প্রত্যেক দেশের সভ্যতার ইতিহাসেও তেমনই পরিবর্তনের লীলা দেখা যায়। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মগধের বা ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ কি আরও দুই—এক বছর আগে। তার কিছু কম দেড় শতাব্দী পরে মৌর্য সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। তারপর ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখি সুঙ্গ, কান্ব ও অন্ধ্র প্রভৃতি বংশের কমবেশি প্রভুত্ব। ইতিমধ্যে গ্রিকরাও বারকয়েক ভারতের মাটিতে আসন পাতবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি।

কেবল গ্রিকরা নয়, মধ্য এশিয়ার ভবঘুরে মোগলজাতি তখন থেকেই ভারতবর্ষে হানা দেবার চেষ্টা করছিল। মোগল বলতে তখন মুসলমান বোঝাত না (নিজ মঙ্গোলিয়ায় আজও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মোগলরা আছে) এবং মোগল বলতে আসলে কী বোঝায় সে সম্বন্ধেও সকলের খুব পরিষ্কার ধারণা নেই। যুগে যুগে নানা জাতি মোগলদের নানা নামে ডেকেছে। এদের বাহন ছিল ঘোড়া, খাদ্য ছিল

মাংস, পানীয় ছিল দুগ্ধ। গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোদোতাস এদের ডেকেছেন "সিথিয়ান' বলে, পরবর্তী যুগের রোমানরা এদের' হুন' নামে ডাকতেন, প্রাচীন ভারতে এদের নাম ছিল 'শক', এবং চিনারা এদের নাম দিয়েছিল Hiungnu আসলে মোগল, শক, হুন, তাতার ও তুর্কিরা একরকম এক জাতেরই লোক, কারণ তাদের সকলেরই উৎপত্তি মধ্য এশিয়ায় বা মঙ্গোলিয়ায়। এই আশ্চর্য জাতি ধরতে গেলে এক সময়ে প্রাচীন পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশকেই দখল করেছিল এবং ভারতবর্ষ তাদের অধিকারে এসেছিল দুইবার। প্রথমবারে তাদের বংশ কুষাণ বংশ বলে পরিচিত হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বিখ্যাত সম্রাট কনিষ্ক এই বংশেরই ছেলে। দ্বিতীয়বারে তারা মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করে।

মোগল বা শকরা ভারতে এসে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবে নিজেদের সমস্ত বিশেষত্ব——এমন কি ধর্ম পর্যন্ত হারিয়ে একেবারে এদেশের মানুষ হয়ে পড়েছিল। কনিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধ, তবু তাঁর নামে বিদেশি গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু কুষাণ বংশের শেষ সম্রাট বাসুদেবের নামই কেবল ভারতীয় নয়, ধর্মেও তিনি ছিলেন শৈব মতাবলম্বী হিন্দু। কারণ তাঁর নামাঙ্কিত প্রায় প্রত্যেক মুদ্রায় দেখা যায় শিব এবং শিবের ষাঁড়ের প্রতিমূর্তি।

আনুমানিক ২২০ খ্রিস্টাব্দে বাসুদেবের মৃত্যু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হয় কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন। যদিও তারপরেও কিছুকাল পর্যন্ত ভারতের এখানে ওখানে কুষাণদের খণ্ড খণ্ড রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু কুষাণদের কেউ আর সম্রাট নামে পরিচিত হতে পারেননি।

মোগল বা শকদের রাজত্বের সময়েই ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে গোধূলির ম্লান আলো। প্রাচীনতর হলেও মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ যেন স্পষ্ট রূপে ও রেখায় আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। শক ভারতবর্ষে তেমনভাবে নজর চলে না—সেটা ছিল যেন আলো—মাখানো ছায়ার যুগ, তার খানিকটা স্পষ্ট আর খানিকটা অস্পষ্ট।

কিন্তু কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে এল সত্যিকার তমিস্রযুগ। যেন এক অমাবস্যার মহানিশা এসে সমগ্র আর্যবর্তকে তার বিপুল আঁধার আঁচলে ঢেকে দিলে। অবশ্য, এ সময়কার হিন্দুস্থানে কোনও সাম্রাজ্য ও সম্রাট না থাকলেও ছোটো ছোটো রাজ্যের ক্ষুদে ক্ষুদে রাজার যে অভাব ছিল না, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। নানা পুরাণে এ সময়কার যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তাও ভাসা ভাসা, রহস্যময়। ওই ক্ষুদে রাজাদের কারুর ভিতরে এমন শক্তি ও প্রতিভা ছিল না যে সমগ্র ভারতের উপরে বিপুল একছত্র তুলে ধরেন। এক এক দেশের সিংহাসন পেয়ে এবং বড়ো জোর প্রতিবেশি ছোটো ছোটো রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ বা ঝগড়া করেই তাঁরা তুষ্ট ছিলেন। এই গভীর অন্ধকার জগতে মাঝে মাঝে যেন, বিদ্যুৎ—চমকের মধ্যে দেখা যায় আভিরাস, যবন, শক, বাহ্লীক ও গর্দব্বিলাস প্রভৃতি অদ্ভুত বা বিদেশি বংশকে!

বৃহৎ ভারতের আত্মা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনুমানে বোঝা যায়, তখন ক্রমেই বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন হচ্ছিল এবং হিন্দুধর্মের হচ্ছিল ক্রমোন্নতি। কিন্তু তখনকার দেশাচার, কলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথা, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ইতিহাস জানবার কোনও উপায়ই এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র মৌর্য বংশ লোপ পাবার পরেও এবং সেই অন্ধকার যুগেও যে একটি প্রসিদ্ধ নগর বলে গণ্য হত, এ কথা জানা যায়। কিন্তু পাটলিপুত্রের রাজার নাম পাওয়া যায় না। পাঞ্জাবে ও কাবুলে ছিলেন শকবংশীয় কোনও কোনও রাজা। এ কথাও জানা গিয়েছে যে, কাবুলের ভারতীয় শক রাজারা ছিলেন বিলক্ষণ ক্ষমতাবান (৩৬০ খ্রিস্টাব্দেও কাবুলের শক রাজার দ্বারা প্রেরিত ভারতীয় যুদ্ধহস্তী ও সৈন্যের সাহায্যে পারস্যের অধিপতি দ্বিতীয় সাপর প্রাচ্য রোম সৈন্যদের পরাজিত করেন)।

প্রায় এক শতাব্দী এই অন্ধকার রহস্যের মধ্য দিয়ে অতীত হয়ে যায়। এই হারানো ভারতকে আর অতীতের গর্ভ থেকে উদ্ধার করা যাবে না। বহুযুগের ওপর থেকে ভেসে আসে কেবল অন্ধকারের আর্তনাদ!

ইউরোপের অবস্থাও তখন ভালো নয়। গ্রিস তখন গৌরবহীন এবং পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য হয়েছে বর্বর, অন্ধকার যুগের মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কনস্তানতাইন দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পর ইউরোপীয় রোম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল নামে মাত্র। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা যখন মৃত্যুন্মুখ, মহাভারতে জাগল তখন নবজীবনের কলধ্বনি! প্রায় শতাব্দীকাল পরে ঐতিহাসিক ভারতে এল আবার দ্বিতীয় প্রভাত। আমরা আজ সেই নবপ্রভাতের জায়গান গাইবার জন্যেই আয়োজন করছি।

দীর্ঘরাত্রি শেষে প্রাতঃসন্ধ্যা এসে অন্ধকারের যবনিকা যখন সরিয়ে দিলে, তখন দেখলুম। পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বিরাজ করছেন যে রাজা, ইতিহাসে তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত নামে বিখ্যাত (আনুমানিক ৩১৮ খ্রিস্টাব্দে)। তার বাপের নাম ঘটোৎকচ এবং ঠাকুরদাদা ছিলেন শুধু গুপ্ত নামেই পরিচিত।

গুপ্তবংশের উৎপত্তি নিয়ে গোলমাল আছে। কেউ বলেন, তাঁরা ছিলেন নিচ জাতের লোক। কেউ বলেন, তাঁরা ছিলেন অহিন্দু।

লিচ্ছবি জাতি বুদ্ধদেবের সময়েই বিখ্যাত হয়েছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে প্রসিদ্ধ বৈশালী নগরে ছিল লিচ্ছবিদের রাজ্য। লিচ্ছবিরা আর্য না হলেও সম্ভ্রান্ত ছিল অত্যন্ত এবং তাদের শক্তিও ছিল যথেষ্ট।

এই বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিয়ে করে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মানমর্যাদা এত বেড়ে গেল যে, তুচ্ছ "রাজা" উপাধি আর তাঁর ভালো লাগল না। তিনি গ্রহণ করলেন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি এবং স্বাধীন নরপতির মতো নিজের ও রানি কুমারদেবীর নামাঙ্কিত মুদ্রারও প্রচলন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চলল রাজ্য বাড়াবার চেষ্টা। এ চেষ্টাও বিফল হল না। দেখতে দেখতে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিরহুত ও অযোধ্যা প্রভৃতি দেশ হস্তগত করে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত প্রমাণ করলেন যে সত্যসত্যই তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি লাভের যোগ্য। ওদিকে তার রাজ্যসীমা গঙ্গা—যমুনার সঙ্গমস্থল (আজ যেখানে এলাহাবাদের অবস্থান) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যাভিষেকের পরে নিজের নামে তিনি এক নতুন অব্দও চালালেন—তা গুপ্তাব্দি বলে পরিচিত।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বেশিদিন রাজ্যসুখ ভোগ করতে পারেননি। কিন্তু ছোট্ট একটি খণ্ড রাজ্যের মালিক হয়েও তিনি যখন মাত্র দশ—পনেরো বছরের ভিতরেই নিজের রাজ্যকে প্রায় সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন, তখন তাঁর যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ বীরত্ব ও যথেষ্ট যুদ্ধকৌশলের অভাব ছিল না, এ সত্য বোঝা যায় সহজেই। ম্যাসিদনের অধিপতি ফিলিপ তীর সমধিক বিখ্যাত পুত্র আলেকজান্ডারের জন্যে এমন দৃঢ় ভিত্তির উপরে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন যে বিশেষজ্ঞদের মতে ফিলিপের মতো রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধকৌশলী পিতা না পেলে আলেকজান্ডার বিশ্বজয়ী হতে পারতেন। কিনা সন্দেহ! গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তও আর এক অতি বিখ্যাত পুত্রের পিতা। অতি অল্পদিনে খণ্ড—বিখণ্ড ভারতবর্ষে তিনি এমন এক অখণ্ড ও বিপুল রাজ্য স্থাপন করে গেলেন যে অদূর ভবিষ্যতেই আকারে ও বলবিক্রমে তা প্রায় সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য সাম্রাজ্যের সমান হয়ে উঠেছিল এবং তার স্থায়িত্ব হয়েছিল কিছু কম দুইশত বৎসর! ব্যাপকভাবে ধরলে বলতে হয়, ভারতবর্ষের উপরে গুপ্তযুগের অস্তিত্ব ছিল তিনশত পঞ্চাশ বৎসর।

বলেছি, গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব নিশান্তকালে প্রাতঃসন্ধ্যায়। কিন্তু ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতের গৌরবময় অপূর্ব সূর্যোদয় তখনও হয়নি। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তরুণ সূর্যের জন্যে অরুণ আসর সাজিয়ে রাখলেন। তারপরই হল গৌরবময় সূর্যোদয়। আর্যবর্ত তারপরে আর কখনও দেখেনি তেমন আশ্চর্য সূর্যকে। তারই বিচিত্র কিরণে সৃষ্ট হয়েছিল ভারতের যেসব নিজস্বতা বা বিশেষত্ব,

আজও বিশ্বসভায় তাই নিয়ে আমরা গর্ব করে থাকি। ভারতের অমর কালিদাস গুপ্তযুগেরই মানুষ। কেবল কি কালিদাসের কাব্য? ‘মৃচ্ছকটিক’, 'মুদ্রারাক্ষস’ প্রভৃতি অতুলনীয় সাহিত্যারত্নের সৃষ্টি গুপ্তযুগেই। প্রাচীনতম পুরাণ ‘বায়ুপুরাণ’ এবং ‘মনুসংহিতা’ও তাই। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিষজ্ঞ হিসাবে গুপ্তযুগের বরাহমিহির ও আর্যভট্টের নাম বিশ্ববিখ্যাত। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় গুপ্তযুগের প্রতিভাকে প্রমাণিত করবার জন্য আজও বিদ্যমান আছে অজন্তা, ইলোরা, সাঁচি, সারনাথ, ভুরহুত, অমরাবতী ও শিগিরি প্রভৃতি। দিল্লির বিস্ময়কর লৌহস্তম্ভের জন্ম গুপ্তযুগেই। সঙ্গীতকলাও হয়ে উঠেছিল সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ। কত আর নাম করব?

এতক্ষণ গেল ইতিহাসের কথা। পরের পরিচ্ছদেই আমাদের গল্প শুরু হবে এবং দেখা দেবেন আমাদের কাহিনির নায়ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন ছুটেছে সুদূর, সুদূর, সুদূর পারে—
সূর্যালোকে, চন্দ্রকরে, অন্ধকারে
ইচ্ছা যে তার বিশ্ববাটে ঝোড়ো—হাওয়ার সঙ্গে হাঁটে
বন্দি দেহ মউঠছে কেঁদে বন্ধ—দ্বারে

পাটলিপুত্র! সমগ্র ভারতবর্ষে এ নামের তুলনা নেই এবং গৌরবে এই নগর দিল্লির চেয়েও বড়ো!

গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে যখন পাটলিপুত্রকে দেখেন, তখন তার মতো বৃহৎ নগর আর্যাবর্তে আর দ্বিতীয় ছিল না।

গ্রিক বর্ণনা থেকে পাটলিপুত্র সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানা যায়। গঙ্গানদী যেখানে শোন নদের সঙ্গে এসে মিলেছে, পাটলিপুত্রের অবস্থান সেইখানেই। আজ পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে আছে পাটনা শহর।

সেকালে যেসব নগর থাকত সমূদ্র বা নদীর তীরে, সাধারণত তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করবার সময়ে ইটের বদলে কাঠের ব্যবহারই হত বেশি। কাঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়, তাই তখনকার স্থাপত্য—শিল্পের কোনও নিদর্শন আজ আর দেখবার উপায় নেই।

প্রকাণ্ড পাটলিপুত্র নগর, তার ভিতরে বাস করে লক্ষ লক্ষ মানুষ। খ্রিস্ট জন্মাবার পাঁচশত বৎসর আগে তার প্রতিষ্ঠা হয়। দৈর্ঘে সে ছিল নয় মাইল এবং প্রস্থে দেড় মাইল। তার চারদিক উচু ও পুরু কাঠের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বহিঃশত্রুকে বাধা দেবার জন্যে প্রাচীরগাত্রের সর্বত্রই ছিদ্র ছিল, ভিতর থেকে তীরনিক্ষেপের সুবিধা হবে বলে। প্রাচীরের মাঝে মাঝে ছিল বুরুজ, তাদের সংখ্যা ৬৭০। প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্যে নগরদ্বার ছিল ৬৪টি। প্রাচীরের পরেই যে

পরিখাটি নগরকে বেষ্টন করে থাকত সেটি চওড়ায় ছয়'শ ফুট এবং গভীরতায় ত্রিশ হাত ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাটলিপুত্র তার কোলের উপরে দেখেছিল রাজবংশের পর রাজবংশের উত্থান ও পতন।

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠার আগে ভারতবর্ষে এসেছিল যখন অন্ধযুগ, তখনও পাটলিপুত্র ছিল একটি বিখ্যাত ও বৃহৎ নগর এবং তখনও যিনি পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করতে পারতেন, লোকচক্ষে তিনি হতেন। পৃথিবীরই অধিকারী।

গুপ্তযুগে চিন পরিব্রাজক ফা হিয়েন স্বচক্ষে পাটলিপুত্রকে দেখে যে উজ্জ্বল বর্ণনা করে। গেছেন তা পড়লেই বোঝা যায়, মৌর্যবংশের পতনের পরেও সে ছিল গৌরবের উচ্চচূড়ায়।

অপূর্ব প্রসাদ করত পথিকের বিস্মিত দৃষ্টিকে আকর্ষণ! সাধারণের বিশ্বাস ছিল, এ প্রাসাদ মানুষের গড়া নয়!

কেবল কাঠের বাড়ি নয়, পাটলিপুত্র তখন বহু ইটপাথরের বাড়ির জন্যেও গর্ব করতে পারত, কারণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প তখন যথেষ্ট উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। পথে পথে ছুটছে আরোহীদের নিয়ে উট, অশ্ব ও রথ! মাঝে মাঝে দেখা যায় রাজহস্তীর শ্রেণি।

রাজপথের এক জায়গায় রয়েছে প্রকাণ্ড একটি হাসপাতাল। তার দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে একজন ঘোষণা করছে।

গরিব, অসহায়, পঙ্গু রোগীরা এখানে আগমন করুক। এখানে তাদের যত্ন ও পরিচর্য করা, চিকিৎসককে দেখান আর ঔষধ—পথ্য দেওয়া হবে। তারা সম্পূর্ণ আরামে বাস করতে পারবে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত!

বলা বাহুল্য, সারা পৃথিবীর কোনও দেশেই তখন এমন হাসপাতাল ছিল না। পৃথিবীতে প্রথম সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন বৌদ্ধ সম্রাট

অশোক। পাটলিপুত্রের রাজা এখন হিন্দু হলে কী হয়, অশোকের মানবতার প্রভাব তাকেও অভিভূত করে। কেবল হাসপাতাল নয়, নগরের নানাস্থানে আরও অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে এবং রাজধানীতে যে বৌদ্ধ প্রভাবও সামান্য নয়, এর প্রমাণ পাওয়া যায় বড়ো বড়ো বৌদ্ধ মঠগুলিকে দেখলে। কোনও মঠে থাকেন মহাযান এবং কোনও মঠে হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। সেইসব মঠে বাস করে শত শত শিক্ষার্থীও । সন্ন্যাসীদের পণ্ডিত্য ছিল এমন অসাধারণ যে ভারতের দূর—দূরান্ত থেকে—এমন কি ভারতের বাহির থেকেও ছাত্ররা আসত বিদ্যালাভ করতে। পাটলিপুত্রের এমনই একটি মঠে থেকে চিনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন সংস্কৃত শেখবার জন্যে পুরো তিনটি বৎসর কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

পাটলিপুত্রের প্রজারা পরম সুখে কালযাপন করত। ফা হিয়েনের বিবরণ পড়লে মনে হয়, পুরাকালের কল্পিত রামরাজত্বেও প্রজারা এর চেয়ে সুখে বাস করত না। গৃহস্থরা রাত্রে বাড়ির সদর দরজা খোলা রেখেও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারত—সভ্যতা—গার্বিত ইংরেজ রাজত্বেও আজ যা অসম্ভব। গুরুতর অপরাধের সংখ্যা ছিল এত কম যে প্রাণদণ্ডের কথা লোকে জানতই না। বারংবার ডাকাতি করলে বড়ো জোর অপরাধীর ডান হাত কেটে নেওয়া হত। কিন্তু এই চরম দণ্ড দেবার দরকার হত না প্রায়ই। অধিকাংশ অপরাধেরই শাস্তি ছিল জরিমানা মাত্র!

নগরের মাঝখানে গুপ্ত রাজপ্রসাদ। এটিও পাথরের তৈরি। তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির যুগে ভারতের যে নিজস্ব শিল্পীরীতি অপূর্বতা সৃষ্টি করেছিল পূর্ণ মহিমায়, মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের আগেই তার প্রথম প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। এইটেই স্বাভাবিক। ফুল আগে কুঁড়ির আকারে দেখা না দিয়ে একেবারে ফোটে না। মৌর্য সম্রাট অশোকের যুগেও ভারত—শিল্পের নিজস্ব রীতি আত্মপ্রকাশ করেনি এবং মৌর্য রাজপ্রসাদ ও ভাস্কর্যের উপরে পারসি প্রভাব ছিল অল্পবিস্তর। তারপর উত্তর ভারতের শিল্পের উপরে পড়ে গ্রিক প্রভাব,——তার প্রমাণ গান্ধার—ভাস্কর্য। কিন্তু

তারপর থেকেই ভারত—শিল্পীর দৃষ্টি ফিরে আসতে শুরু করে ঘরের দিকে। সেই দৃষ্টি পরিবর্তনের সুফল দেখি অজন্তা, ইলোরা, সাঁচি, সারনাথ, ভরহুত, অমরাবতী ও শিগিরি প্রভৃতি স্থানে। রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে একটি তপোবনের মতো মনোরম জায়গা। সেখানে নানা জাতের শত শত তরুলতা করেছে স্নিগ্ধ শ্যামলতা সৃষ্টি, সেখানে ঘাসের নরম গালিচার উপরে খেলা করছে আলো আর ছায়া, সেখানে উপরে বসে গান গায় স্বাধীন বনের পাখি, নিচে নেচে নেচে বেড়িয়ে বেড়ায় ময়ূর ও হরিণের দল, সরোবরে জললীলায় মাতে মরাল—মরালীরা। সরোবরের ধারে একখানি কাঠের বাড়ি, তার সর্বত্র শিল্পীর হাতের কারুকার্য।

ভারতে যেসব প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান আছে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে। কারণ সেসব স্থাপত্য পাথরে গড়া হলেও তাদের শিল্পীরা অনুকরণ করেছে পূর্ববতী যুগের কাঠের শিল্পকেই।

সরোবরের জলে মিষ্টি হাওয়ায় আবেশে কেঁপে কেঁপে ফোটা—অফোটা কমলেরা এবং তাদের উপরে ঝরে পড়ছে নরম রোদের সোনালি স্নেহ। ঘাটের সিঁড়ির উপরে বসে একটি তরুণী আনমনে দেখছিল, পদ্মফোটার খবর পেয়ে কোথা থেকে উড়ে আসছে মধুলোভী ভ্রমররা।

এমন সময়ে বাড়ির ভিতরে কার হাতে জেগে উঠল এক মধুর বীণ! তরুণী হাসিমুখে কান পেতে শুনলে যে এই সুন্দর প্রভাতে আনন্দময়ী ভৈরবী রাগিণীর মধ্যেও যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে বীণকারের মন। হাসতে হাসতে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর বাড়ির ভিতরে গেল।

বাগানের ধারে একখানি ঘরে উচ্চ কাষ্ঠাসনে বসে একটি যুবক আপনমনে বীণার তারে তারে করে যাচ্ছে অঙ্গুলিচালনা।

যুবকের বর্ণ শ্যাম, মাথায় কুঞ্চিত কেশদাম, উন্নত কপাল, ডাগর চোখ, টিকালো নাক, ওষ্ঠ্যাধরের উপরে নতুন গোঁফের রেখা। তার কানে দুলছে হীরকখচিত সুবর্ণকুণ্ডল, গলায় দুলছে রত্নহার, পরনে দামি রেশমি সাজ। তার

সুদীর্ঘ দেহের ভিতর থেকে বলিষ্ঠ যৌবনের উদ্দীম শক্তি যেন মাংসপেশিগুলোকে ঠেলে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার দিকে তাকালেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে সে হচ্ছে অসাধারণ যুবক, তার সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন মানুষ দুর্লভ।

যুবক দুই চোখ মুদে এমন একমনে বীণা বাজাচ্ছিল যে জানতেও পারলে না, তরুণী ঘরে ঢুকে একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল। তরুণী হাসিমুখে ডাকলে, "চন্দ্রপ্রকাশ!" যুবক চমকে উঠে চোখ খুলে তরুণীর দিকে তাকলে,— কিন্তু সে দৃষ্টি দেখলে মনে হয়, তার স্বপ্নমাখা চোখ যেন তরুণীকে ছাড়িয়ে, ঘরের দেওয়াল ভেদ করে চলে গিয়েছে দূরে, বহুদূরে!

—চন্দ্রপ্রকাশ!

—পদ্মাবতী!' একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে যুবক বীণার তার থেকে হাত তুললে।

—চন্দ্রপ্রকাশ, তুমি আমার বাবার যোগ্য ছাত্রই বটে! ভোরবেলার শাস্ত্র অধ্যয়নের সময়ে বীণা বাজিয়ে কান্না শুরু করেছ!

—তাহলে আমার কান্না তুমি শুনতে পেয়েছ?"

—কান্না তো তোমার নিত্যই শুনি, দিনে দিনে তুমি যেন হাসিকে ভুলে যেতে বসেছ!

—না পদ্মা, এ আমার মনের কান্না নয়, এ হচ্ছে আমার দেহের কান্না! –

—দেহের কান্না?

—হ্যাঁ, বন্দি দেহের কান্না। আমার যৌবনের কান্না!

—যৌবন তো হাসে চন্দ্রপ্রকাশ, যৌবন তো কাঁদে না?

—হাসতে পারে কেবল স্বাধীন যৌবন। দেহের সঙ্গে আমার যৌবনও অলস হয়ে গণ্ডির ভিতরে বন্দি হয়ে আছে। এ গণ্ডি আমি ভাঙতে চাই, কিন্তু পারছি না।

—তাই এমন সুন্দর প্রভাতটিতে তোমার কান্নার সুরে ভরিয়ে তুলতে চাও?

—তাছাড়া আর কী করতে পারি পদ্মা? মহারাজা চান, আমি তোমার পিতার শিষ্য হই। তোমার পিতা চান শাস্ত্রলোচনা করে আমি ধার্মিক হই। কিন্তু আমি চাই বিশ্বের রাজপথে মহাপ্রস্থান করতে।

—মহাপ্রস্থান করতে? তুমি আর ফিরতে চাও না?

—ঠিক তা নয় পদ্মা? ফিরতে পারি, সফল যদি হই—স্বপ্ন যদি সত্য হয়।

—যুবরাজ—

—আবার তুমি আমার নাম না ধরে আমাকে যুবরাজ বলে ডাকছ? কে যুবরাজ? জানো আমার বৈমাত্রেয় ভাই কচ আছেন?

—কিন্তু প্রজারা তাঁকে চায় না।

—থাক, ওসব কথা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। তার চেয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপটি করে ওইখানে গিয়ে বসে। আমার স্বপ্নকাহিনি শোন। বিচিত্র এই স্বপ্ন—এর মধ্যে আছে মহাভারতের কণ্ঠস্বর!

এই চন্দ্রপ্রকাশ কে? মগধের রাজপুত্র। পাটলিপুত্র একে আরও দুই নামে জানেবালাদিত্য, পরাদিত্য।

পদ্মাবতী হচ্ছেন বৌদ্ধ শাস্ত্রকার ও চন্দ্রপ্রকাশের শিক্ষাগুরু বসুবন্ধুর পালিত কন্যা, রাজপুত্রের বান্ধবী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীর্ণ—জরার নাট্যশালায় জাগ্রত হও রুদ্র!
ভারত ভরে অগ্নি করো বৃষ্টি!
উড়ুক হাতে মৃত্যু—নিশান, মরুক যত ক্ষুদ্র,—
তবেই হবে নতুন প্রাণের সৃষ্টি।

পদ্মাবতী একখানি আসন গ্রহণ করে বললে, চন্দ্রপ্রকাশ, প্রভাত হচ্ছে জাগরণের কাল। স্বপ্নের কথা এখন ভুলে যাও।

চন্দ্রপ্রকাশ ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, না পদ্মা, এখন প্রভাত, এলেও বিশাল ভারত আর জাগে না। এমন গভীর তার ঘুম যে স্বপ্ন দেখবার শক্তিও তার নেই। এই ঘুমন্ত আর্যাবর্তে আজ স্বপ্ন দেখছে কেবল দুজন লোক।

পদ্মাবতী হেসে বললে, বুঝতে পারছি, দুজনের একজন হচ্ছে তুমি। আর একজন কে?”

—আমাদের পিতৃদেবী, মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

—তিনিও স্বপ্ন দেখেন নাকি?

চন্দ্রপ্রকাশ পরিপূর্ণ স্বরে বললেন, নিশ্চয়! নইলে মগধ সাম্রাজ্য আজ গঙ্গা—যমুনার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারত না। এই সাম্রাজ্য বিস্তার সম্ভব হয়েছে স্বপ্নাদেশের ফলেই।

পদ্মাবতী কৌতুহলী স্বরে বললে, চন্দ্রপ্রকাশ, তোমাদের স্বপ্নের কথা শোনবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে। কী স্বপ্ন তুমি দেখ?

—আমি সেই স্বপ্ন দেখি পদ্মা, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত যা দেখেছিলেন।

—আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো।

—কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ভারতের ক্ষত্রধর্ম বহু যুগ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর সেই দুর্বলতার সুযোগে পঙ্গপালের মতো যবন সৈন্যের পর

যবন সৈন্য এসে ছেয়ে ফেলেছিল আর্যবর্তের বুক। চারিদিকে তুচ্ছ যত খণ্ডরাজ্য—তারা কেউ কারুকে মানে না, তাদের কেউ জানে না একতার মাহাত্ম্য! পরস্পরের কাছ থেকে দু—চারটে গ্রাম বা নগর কেড়ে নিয়েই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করত। মাথার উপরে ঝুলন্ত যখন যবন—দিগ্বিজয়ীর তরবারি, তখনও হত না তাদের চেতনা! নির্লজ্জের মতো যবনের আনুগত্য স্বীকার করে রাজারা যদি নিজেদের মুকুট বাঁচাতে পারতেন, তাহলেই হতেন পরম পরিতৃপ্ত। সাড়ে ছয়শো বৎসর আগে এই অধমদের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত—চক্ষে ছিল তাঁর অখণ্ড মহাভারতের স্বপ্ন। নিজের জীবনেই তিনি সফল করেছিলেন তীর সেই অপূর্ব স্বপ্নকে! আমি তাকে ভীমার্জ্জুনের চেয়ে মহাবীর বলে মনে করি।

পদ্মাবতী বিস্মিত স্বরে বললে, চন্দ্রপ্রকাশ, তুমিও কি আবার সেই অসম্ভব স্বপ্ন দেখতে চাও?

—যা একবার সম্ভবপর হয়েছে, তাকে অসম্ভব বলছ কোন পদ্মা? মৌর্য চন্দ্রগুপ্তও এই মগধের সন্তান। আর সেই স্বপ্নকে আবার সত্যে পরিণত করতে চান বলেই হয়ত আমার পিতৃদেবও চন্দ্রগুপ্ত নাম ধারণ করেছেন।

পদ্মাবতী বললে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য কি আর পূর্ণ হবে? মহারাজা একে বৃদ্ধ হয়েছেন, তার উপরে কঠিন ব্যাধির আক্রমণে শয্যাগত। ভগবান বুদ্ধদেবের কৃপায় তিনি রোগমুক্ত হলেও এই বয়সে আর কি সারা ভারতের উপরে এক ছত্র তুলে ধরতে পারবেন?

চন্দ্রপ্রকাশ দৃপ্তস্বরে বললেন, "পিতার পুনর্জন্ম হয় পুত্রের মধ্যেই। মহারাজ যে ব্রত গ্রহণ করেছেন, তা উদযাপন করব আমিই। ভারতের দিকে দিকে আজ দুর্বল হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করে আছে শত শত নগণ্য রাজা। তাদের মন সংকীর্ণ, চোখ অন্ধ, চরণ গণ্ডির ভিতরে বন্দি। তাদের কেউ হচ্ছে শক, কেউ হচ্ছে যবন, কেউ হচ্ছে দ্রাবিড়ী।। তাদের অবহেলায় ভারতের ক্ষত্রিয় ধর্ম, প্রাচীন সভ্যতা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান একেবারে অধঃপাতে যেতে বসেছে। সম্রাট

অশোকের যুগে আর্যাবর্তের নামে সারা পৃথিবীর মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ত, কিন্তু আজ ভারতকে কেউ চেনে না। আর্যাবর্তেই আর্য আদর্শ নেই! দীর্ঘকাল অনার্য, শকদের কবলে পড়ে ভারতের অমর আত্মাও আজ মীর মর, অচেতন। ভারতব্যাপী এই ক্ষুদ্রতার উপর দিয়ে আমি জ্বলন্ত উল্কার মতো ছুটে যেতে চাই, চারিদিকে আগুন ছড়াতে ছড়াতে! আমি নিষ্ঠুর হব, ভয়ানক হব, আগে করব ধ্বংস—কেবল ধ্বংস আর ধ্বংস আর ধ্বংস! তারপর সেই সমস্ত জড়তা, দীনতা, হীনতা আর ক্ষুদ্রতার রক্তাক্ত ধ্বংসস্তুপের মধ্যে বসে আবার আমি গড়ে তুলব। আমার স্বপ্নে দেখা সত্যিকার ভারতকে!' হঠাৎ চলন্ত কাষ্ঠপাদুকর শব্দ উঠল। চন্দ্রপ্রকাশ ভাবের আবেগে প্রায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে চিৎকার করে নিজের মনের কথা বলে যাচ্ছিলেন, সে শব্দ তিনি শুনতে পেলেন না। কিন্তু পদ্মাবতী খড়মের আওয়াজ পেয়েই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, চুপ করো চন্দ্রপ্রকাশ, চুপ করে! বাবা আসছেন!

পীতবস্ত্র ও উত্তরীয়ধারী বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ এবং বিখ্যাত গ্রন্থকার বসুবন্ধু ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। তার মাথার চুল ও দাড়ি—গোঁফ কামানো, বয়স ষাটের কম নয়। মুখখানি প্রশান্ত—যদিও সেখানে এখন ফুটে উঠেছে বেদনার আভাস!

ঘরে ঢুকে বসুবন্ধু একবার চন্দ্রপ্রকাশের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকালেন। তারপর একটু নীরব থেকে বললেন, বৎস, আসতে আসতে আমি তোমার কথা শুনতে পেয়েছি। আমার এই আশ্রমে বসে তুমি ধ্বংসের মন্ত্র উচ্চারণ করছ!

চন্দ্রপ্রকাশ মুখ নামিয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ গুরুদেব! আমি ধ্বংস করতে চাই ভারতব্যাপী দীনতা আর জড়তাকে!

মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বসুবন্ধু বললেন, আমারও সেই কর্তব্য। জ্ঞানের আলো দেখিয়ে আমি হীনকে করে তুলতে চাই মহৎ । কিন্তু তুমি কীসের সাহায্যে দীনতা আর জড়তাকে ধ্বংস করবে?

—গুরুদেব, আমি রাজপুত্র। আমার অবলম্বন তরবারি।

দুঃখিত স্বরে বসুবন্ধু বললেন, আমি তোমাকে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি। বৎস, অস্ত্রশিক্ষা দিইনি। আমার শাস্ত্র রচনা করেছেন ভগবান বুদ্ধদেব, সর্বজীবে অহিংসাই ছিল যাঁর বাণী।

—আবার বলি গুরুদেব, আমি রাজপুত্র। রাজধর্ম হচ্ছে রাজ্যবিস্তার করা। তরবারি কোষাবদ্ধ থাকলে রাজধর্ম পালন করা হয় না।

—বৎস, তুমি ভুল বলছ। সম্রাট অশোক কি রাজধর্ম পালন করেননি? তাঁর অধীনে কি বিরাট ভারত—সাম্রাজ্য পৃথিবীতে অতুলনীয় হয়ে ওঠেনি? তিনি কি অস্ত্র ত্যাগ করে অহিংসার আশ্রয় নেননি?

চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সম্রাট অশোককে আর রাজ্যবিস্তার করতে হয়নি, সে কর্তব্য প্রায় শেষ করে গিয়েছিলেন তার পিতামহ চন্দ্রগুপ্তই। কিন্তু সম্রাট অশোক তরবারি ত্যাগ করেছিলেন বলেই তাঁর মৃত্যুর পরেই হয়েছিল মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন।

বসুবন্ধু বললেন, আমার কাছে সাম্রাজ্যের পতন খুব বড়ো কথা নয় রাজকুমার! আমি চাই কেবল আত্মাকে পতন থেকে রক্ষা করতে। রক্তসাগরে সাঁতার দেয় পশুর আত্মাই, সেখানে ঠাই নেই মনুষ্যত্বের! বৎস, তোমাকে এই শিক্ষাই আমি বার বার দিয়েছি, আমার শিক্ষা কি তবে ব্যর্থ হবে?

নিরামিষের ভক্ত হতে পারে? অস্ত্রহীন ক্ষত্রিয় সন্তান, একথা কি কোনওদিন কল্পনাতেও আসে? প্রেমের মন্ত্রে বিশ্বের হৃদয় জয় করা যায়, ভগবান বুদ্ধদেব যা করে গেছেন। কিন্তু ভারতব্যাপী হিংস্র পশুত্বকে দমন করতে পারে কেবল শক্তির মন্ত্র। কুরুক্ষেত্রে অর্জন যদি অস্ত্রত্যাগ করতেন, তাহলে কে করত এখানে ধর্মরাজ্য স্থাপন? চন্দ্রগুপ্তের তরবারি। যদি হিন্দুস্থানের সমস্ত দীনতাকে হত্যা না করত, তবে কী করে প্রতিষ্ঠিত হত। অশোকের প্রেমধর্ম? গুরুদেব,

গুরুদেব, আগে আমাকে আগাছা কেটে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে দিন, তারপর সেখানে ছড়াবেন আপনার প্রেমের বীজ।”

ঘরের বাইরে হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ উঠল। তারপরেই দরজার কাছে এসে অভিবাদন করলে এক রাজভৃত্য। তার মুখেচোখে দারুণ দুর্ভাবনার চিহ্ন!

চন্দ্রপ্রকাশ উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? তুমি এখানে কেন

—মহারাজের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। চিকিৎসকরা বলছেন, তার অন্তিমকাল উপস্থিত। মহারাজা আপনাকে স্মরণ করেছেন!

চন্দ্রপ্রকাশ তাড়াতাড়ি বসুবন্ধুর চরণে প্রণাম করে বললেন, ‘গুরুদেব, গুরুদেব! আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার! মগধের মঙ্গলের জন্যে ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করুন!’ তারপরে উঠেই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেলেন।

বসুবন্ধু চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, পদ্মা, সত্যই আজ মগধের অতি দুর্দিন! মহারাজের যদি মৃত্যু হয়, তবে সিংহাসনে বসবে কে? চন্দ্রপ্রকাশ, না তার বৈমাত্রেয় ভাই কচ?

পদ্মাবতী বললেন, প্রজারা চন্দ্রপ্রকাশকেই যুবরাজ বলে জানে, আর মহারাজের উপরে চন্দ্রপ্রকাশের মা কুমারদেবীর প্রভাব কত বেশি, সে কথা তো আপনিও জানেন বাবা!

বলে মনে হয় না! পদ্মা, মগধ রাজ্যে শীঘ্রই মহা অশান্তির সম্ভাবনা—ভ্রাতৃবিরোধ, ঘরোয়া যুদ্ধ, রক্তপাত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্ষুদ্র কাজে মরতে যে চায়
হয় সে পশু, নয় সে দানব!
বৃহৎ ব্রত—উদযাপনে
মরতে পারে কেবল মানব!

পাটলিপুত্রের রাজপ্রসাদ ঘিরে রয়েছে আজ বিরাট জনতা। উৎসব করে জনতা সৃষ্টি, কিন্তু এ উৎসবের জনতা নয়। কারণ জনতার প্রত্যেকেরই মুখে—চোখে রয়েছে আসন্ন বিপদের আভাস।

রাজবাড়ির সিংহদ্বারের পিছনে ও প্রাঙ্গণের উপরে দেখা যাচ্ছে সজ্জিত ও সশস্ত্র সৈন্যের জনতা, সেখানে অসংখ্য শূল ও নগ্ন তরবারির উপরে প্রভাত—সূর্য জেলে দিয়েছে যেন অসংখ্য বিদ্যুৎ—দীপের চঞ্চল শিখা!

রাজবাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার নাগরিক এবং দেখলেই বোঝা যায় শোক ও দুশ্চিন্তায় তারা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে।

কাতর হবারই কথা। কেবল মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে বলেই প্রজারা ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় এমন ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এই প্রজাবৎসল মহারাজাকে তারা সবাই ভালবাসত বটে, কিন্তু একথাও সকলে জানত যে কাল পূর্ণ হলে পৃথিবীতে কেউ বর্তমান থাকতে পারে না। তাদের দুর্ভাবনার অন্য কারণ আছে।

আমরা যে যুগের কথা বলতে বসেছি তখন পৃথিবীর সব দেশেই রাজার মৃত্যু হলে প্রজার আতঙ্কের সীমা থাকত না। কারণ প্রায়ই মৃত রাজার সিংহাসন লাভের জন্যে রাজপুত্রদের ও রাজবংশীয় অন্যান্য লোকদের মধ্যে ঘরোয়া যুদ্ধের অবতারণা হত এবং সেই যুদ্ধ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ত সমস্ত রাজ্যের মধ্যে। নতুন রাজাকে সিংহাসনে বসতে হত মানুষের রক্ত—সমুদ্রে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে।

তাই এই সংকট—মুহূর্তে সমগ্র পাটলিপুত্রের প্রজারা আজ রাজবাড়ির কাছে ছুটে এসেছে এবং উত্তেজিতভাবে অদূর—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে করছে নানান রকম জল্পনা—কল্পনা।

এমন সময়ে অদূরে দেখা গেল, বিবর্ণ মুখে দ্রুতপদে এগিয়ে আসছেন রাজকুমার চন্দ্রপ্রকাশ ।

সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়ে জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দূরে সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে থেকে চিৎকার উঠল—"জয়, যুবরাজের জয়!"

চন্দ্রপ্রকাশ সিংহদ্বারের সামনে গিয়ে বিস্মিত নেত্রে দেখলেন, তার পথ জুড়ে অটল প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে একদল সশস্ত্র প্রহরী।

তিনি অধীর স্বরে বললেন, তোমরা মুখের মতো পথ বন্ধ করে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?" প্রহরীদের দলপতি এক পা না সরেই বললে, "রাজবাড়ির ভিতরে এখন আর কারুর ঢুকবার আদেশ নেই।

ক্রুদ্ধস্বরে চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, আদেশ নেই! কে দিলে এই আদেশ?

—মগধ রাজ্যের যুবরাজা

জনতার ভিতর থেকে চিৎকার করে কে বললে, মূর্খ দৌবারিক! পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও । মগধের যুবরাজকে সামনে দেখেও চিনতে পারছি না?

প্রহরী নির্ভীক কণ্ঠে বললে, মগধের যুবরাজ হচ্ছেন কচগুপ্ত। আমরা তারই আদেশ মানব।

চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, মহারাজা আমাকে আহ্বান করেছেন। তোমরা যদি পথ না ছাড়, আমি কোষ থেকে তরবারি খুলতে বাধ্য হব।

প্রহরী দৃঢ় স্বরে বললে, আমরাও তাহলে রাজকুমারকে বাধা দিতে বাধ্য হব।

চন্দ্রপ্রকাশ কিছু বলার আগেই জনতার ভিতর থেকে জেগে উঠল। বহু কণ্ঠে ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনি। তুচ্ছ এক প্রহরী মগধের রাজকুমারের মুখের উপরে

স্পর্ধার কথা বলতে সাহসী হয়েছে দেখে অনেকে তাকে আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে এল। প্রহরীরাও আত্মরক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত হল ।

তখন কী রক্তাক্ত দৃশ্যের সূচনা হত বলা যায় না, কিন্তু সেই মুহূর্তেই রাজবাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এলেন এক প্রাচীন পুরুষ—তাঁর মাথায় শুভ্র কেশ, মুখে শুভ্র , শ্মশ্রু, পরনে বহুমূল্য শুভ্র পোশাক। সকলেই চিনলে, তিনি হচ্ছেন মগধের প্রধানমন্ত্রী।

প্রহরীরা সসম্মানে তাঁকে অভিবাদন করলে। মন্ত্রী বললেন, এ কী বীভৎস ব্যাপার! উপরে মুমূর্ষ মহারাজ, আর এখানে এই অশান্তি!

দৌবারিক নেতা বললে, আমরা কী করব প্রভু? যুবরাজের আদেশেই আমরা দ্বার রোধ করে দাঁড়িয়ে আছি!

মন্ত্রীমহাশয় দুই ভুরু সংকুচিত করে বললেন, মহারাজা জীবিত থাকতে এ রাজ্যে তাঁর উপরে আর কারুর কথা বলবার অধিকার নেই। মহারাজ স্বয়ং রাজকুমার চন্দ্রপ্রকাশকে স্মরণ করেছেন। যদি মঙ্গল চাও, তাহলে এখনই তোমরা রাজকুমারের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও!

প্রহরীরা একবার পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলে। তারপর পথ ছেড়ে দিলে বিনা বাক্যব্যয়ে।

চন্দ্রপ্রকাশ কোনওদিকে না তাকিয়েই ছুটে চললেন রাজবাড়ির দিকে এবং যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন, মহারাজা এখনও পৃথিবীতে বর্তমান, কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কত বড়ো একটা ষড়যন্ত্রের আয়োজন হয়েছে!

মহারাজের, শয়ন—আগারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সুবর্ণখচিত ও হস্তীদন্তে অলংকৃত প্রশস্ত পালঙ্কের উপরে দুই চোখ মুদে শুয়ে আছেন মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত—তাঁর মুখে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া। মহারাজের শিয়রের কাছে পাখা হাতে করে সাশ্রুনেত্রে বসে আছেন। পাটরানি ও চন্দ্রপ্রকাশের মা কুমারদেবী এবং তঁর পাশে অন্যান্য রানি ও পুরু—মহিলারা। পালঙ্কের একপাশে

দাঁড়িয়ে আছেন রাজপুত্র কচ এবং ঘরের ভিতরেই খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন। কয়েকজন অমাত্য ও বড়ো বড়ো রাজকর্মচারী।

চন্দ্রপ্রকাশ ছুটে গিয়ে একবারে খাটের পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়ে অশ্রুজলে গাঢ় স্বরে ডাকলেন, মহারাজ, মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত সচমকে চোখ খুললেন, তাঁর মৃত্যুকাতর মুখও হাস্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। ক্ষীণ স্বরে তিনি বললেন, চন্দ্রপ্রকাশ, এতক্ষণ আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলুম!

—মহারাজ!

—পৃথিবীর রাজ্য আমি পৃথিবীতেই রেখে যাচ্ছি। বৎস, এখন আমাকে আর মহারাজ বলে ডেকো না। বলো, বাবা!

—বাবা, বাবা!

—হাঁ, ওই নামই বড়ো মিষ্টি। মন্ত্রীমশাই, আমার হাতে আর বেশি সময় নেই, যা বলি মন দিয়ে শুনুন। আপনারা সবাই এখানে জানতে এসেছেন, আমার অবর্তমানে মগধের সিংহাসনের অধিকারী হবেন কে? তাহলে চেয়ে দেখুন এই চন্দ্রপ্রকাশের—এই মহৎ যুবকের দিকে। বিদ্যা, বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, বীরত্বে আর চরিত্রবলে অসাধারণ চন্দ্রপ্রকাশকে আপনারা সকলেই জানেন। এখন বলুন, চন্দ্রপ্রকাশ কি অযোগ্য ব্যক্তি?

মন্ত্রীগণ ও অন্যান্য সভাসদদের ভিতর থেকে নানা কণ্ঠে শোনা গেল, নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়!

—মহারাজের জয় হোক!

—আমরা ওঁকেই চাই। প্রভৃতি।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, এটাও কারুর অবিদিত নেই যে পবিত্র আর মহা সম্ভ্রান্ত লিচ্ছবি বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেই আজ আমার এত মানমর্যাদা! মগধের রাজধানী এই পাটলিপুত্রও আমি যৌতুকরূপে পেয়েছি সেই

বিবাহের ফলে। সুতরাং কুমারদেবীর পুত্রেরও পাটলিপুত্রের সিংহাসনের উপরে একটা যুক্তিসঙ্গত দাবি আছে। নয় কি মন্ত্রীমশাই?

প্রধানমন্ত্রী উৎসাহিত স্বরে বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশ এ রাজ্যের সবাই সানন্দে মাথা পেতে গ্রহণ করবে। সমস্ত মগধরাজ্যে রাজকুমার চন্দ্রপ্রকাশের চেয়ে যোগ্য লোক আর দ্বিতীয় নেই।

চন্দ্রগুপ্ত সমেহে চন্দ্রপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাছা, শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে আমি তোমাকে একবার আলিঙ্গন করতে চাই।

চন্দ্রপ্রকাশ কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়িয়ে পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চন্দ্রগুপ্তের চোখও অশ্রুসজল ।

এইভাবে কিছুক্ষণ থেকে চন্দ্রগুপ্ত হঠাৎ গভীর স্বরে বললেন, চন্দ্রপ্রকাশ, উঠে দাঁড়াও!

পিতা?

—প্রতিজ্ঞা করো!

—কী প্রতিজ্ঞা, পিতা?

চন্দ্রগুপ্ত নিজের সব শক্তি একত্র করে পরিপূর্ণ স্বরে বললেন, কঠোর প্রতিজ্ঞা! জানো চন্দ্রপ্রকাশ, আমার জীবনের একমাত্র উচ্চাকাঙক্ষা ছিল, বিপুল আর্যবর্ত জুড়ে করব একছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার, কাপুরুষ সংহার, যবন দমন! মহাভারতে আবার ফিরিয়ে আনব সেই কতকাল আগে হারানো ক্ষত্র যুগকে! কিন্তু কী সংক্ষিপ্ত এই মানুষজীবন! যে ব্রত গ্রহণ করেছিলুম তা সাঙ্গ করে যাবার সময় পেলুম না, তাই আমি তোমাকে এই পৃথিবীতে রেখে যেতে চাই আমারই প্রতিনিধি রূপে। পাটলিপুত্রের সিংহাসন পেয়ে তোমার প্রথম কর্তব্য হবে, দিগ্বিজয়ীর ধর্ম পালন করা, স্বাধীন ভারতে আবার আর্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। পারবে?

চন্দ্রগুপ্তের দুই চরণ স্পর্শ করে চন্দ্রপ্রকাশ সতেজে বললেন, পারব পিতা, পারব! আপনার আশীর্বাদে ক্ষুদ্র ভারতকে আবার আমি মহাভারত করে তুলতে

পারব! যতদিন না আর্যবর্ত জুড়ে স্বাধীন ভারত—সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারি, ততদিন পাটলিপুত্রে আর ফিরে আসব না—এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি!

আনন্দে বিগলিত স্বরে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, 'আশীর্বাদ করি পুত্র, তুমি সক্ষম হও—ভারত আবার ভারত হোক!'—বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ মুদে এল, উপাধানের একপাশে তার মাথাটি নেতিয়ে পড়ল। গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ঘরের ভিতরে পুরললনা ও রানিদের কণ্ঠে জাগল উচ্চ হাহাকার! কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সেই শোকার্তনাদকে ডুবিয়ে বাহির থেকে ছুটে এলো বিপুল জনকোলাহল এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রঝঞ্ঝনা। প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে গবাক্ষের ধারে গিয়ে দেখে বললেন, একি প্রজাবিদ্রোহ?

অতি দ্রুতপদে বাহির থেকে একজন প্রাসাদ—প্রহরী ভয়বিহ্বল মুখে এসে খবর দিলে, শত শত সৈন্য নিয়ে রাজপুত্র কচ প্রাসাদের ভিতরে ছুটে আসছেন।

চন্দ্রপ্রকাশ সচকিত নেত্রে চারিদিকে তাকিয়ে বুঝলেন, ইতিমধ্যে সকলের অগোচরে কচ কখন ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়েছেন।

পালঙ্কের উপর থেকে নেমে এসে কুমারদেবী বললেন, চন্দ্রপ্রকাশ, কচ আসছে তোমাকেই বন্দি বা বধ করতে। কিন্তু কচকে আমি চিনি, এর জন্যেও আমি প্রস্তুত ছিলুম। শীঘ্র তুমি রাজবাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। সেখানে আমার পিত্রালয়ের লিচ্ছবি সৈন্যরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে গঙ্গা পার হয়ে ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হও।

চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, তা হয় না মা। আমি কাপুরুষ নই, সিংহাসন পেয়ে প্রথমেই পলায়ন করা আমার শোভা পায় না।

কুমারদেবী বিরক্ত স্বরে বললেন, আমি তোমার মা, আমার আদেশ পালন করো। মহারাজের অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়ার আগে, তাঁর মৃতদেহের পাশে ভাইয়ে ভাইয়ে

হানাহানি আমি সহ্য করব না। তার উপরে এইমাত্র মহারাজের পা ছুঁয়ে তুমি কী প্রতিজ্ঞা করেছ মনে রেখো। নির্বোধের মতো তুচ্ছ ঘরোয়া যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হবে। তোমার পক্ষে একই কথা। নিজের প্রাণকে রক্ষণ করো উচ্চতর কর্তব্যপালনের জন্যে। যাও, যাও চন্দ্রপ্রকাশ! ওরা যে এসে পড়ল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বীরের বাহু ধরায় অতুল,
নয় সে কোথাও নিঃস্ব,
মরুভূমেও সৃষ্টি করে
নতুন কত বিশ্ব!

চন্দ্রপ্রকাশের পদধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘরের বাইরে শোনা গেল বহুকণ্ঠে কোলাহল ও সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি—জয়, মহারাজা কচগুপ্তের জয়!

কুমারদেবী নিজের মনেই অভিভূত স্বরে বললেন, এখনও অভিষেক হয়নি, এখনও মহারাজের মৃতদেহ শীতল হয়নি, এরই মধ্যে কচ হয়েছে মহারাজা! কী সুপুত্র!

ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কয়েক জন সশস্ত্র সৈন্য। কিন্তু তারা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবার আগেই, কুমারদেবী তাড়াতাড়ি এগিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কী চাও তোমরা?

মহারানিকে দেখে সৈনিকরা থাতমত খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। কেবল তাদের একজন বললে, আমরা এসেছি কুমার চন্দ্রপ্রকাশের—

বাধা দিয়ে কুমারদেবী বললেন, না, কুমার নয়—বলো যুবরাজ চন্দ্রপ্রকাশ!

পিছন থেকে ক্রুদ্ধ স্বরে শোনা গেল, আমি হচ্ছি জ্যেষ্ঠ পুত্র। এ রাজ্যের যুবরাজ হচ্ছি আমি।

কুমারদেবী বললেন, কে, কচ? কিন্তু কে বললে তুমি যুবরাজ? শুনছি তো এরই মধ্যে তুমি নাকি মহারাজা উপাধি পেয়েছ!

কচ এগিয়ে এসে বললেন, সিংহাসন শূন্য হলে তা প্রাপ্য হয় যুবরাজেরই। সেইজন্যেই আমার সৈনিকরা আমাকে ‘মহারাজা’ বলে সম্বোধন করেছে!

প্রধানমন্ত্রী এতক্ষণ পরে কথা কইলেন। হতভম্ব ভাবটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন, রাজকুমার, স্বগীয় মহারাজের আদেশে এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছে চন্দ্রপ্রকাশ। সুতরাং 'মহারাজা' উপাধির উপরে আপনার আর কোনওই দাবি নেই!

কচ কর্কশ স্বরে বললেন, বৃদ্ধ, আমার মুখের উপরে কথা কইতে তুমি সাহস করো! স্বর্গীয় মহারাজের আদেশ? কে শুনেছে তার আদেশ?

ঘরের ভিতর থেকে মন্ত্রীরা সমস্বরে বললেন, আমরা সবাই শুনেছি।

প্রচণ্ড ক্রোধে প্রায় আত্মহারা হয়ে কচ চিৎকার করে বললেন, ষড়যন্ত্র! রাজভৃত্যদের এতবড় স্পর্ধা! সৈন্যগণ ওদের বন্দি করো। আর, সব ষড়যন্ত্রের মূল চন্দ্রপ্রকাশ কাপুরুষের মতো ঘরের ভিতরে কোথায় লুকিয়ে আছে, খুঁজে দ্যাখো ।

কুমারদেবীর দুই চক্ষে জ্বলে উঠল আগুনের ফিনকি। দরজার দিকে দুই বাহু বিস্তার করে গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, স্বর্গীয় মহারাজা শুয়ে আছেন। এখানে শেষ—শয়ানে। সাধারণ সৈনিক এসে এ ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করবে? আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না! কচ—' তোমার আদেশ প্রত্যাহার করো!

কচ অধীর স্বরে বললেন, সৈন্যগণ, এখন নারীর মিনতি শোনবার সময় নেই, যাও আমার আদেশ পালন করো!

কুমারদেবী বললেন, 'কাচ, আমি, নারী হতে পারি, কিন্তু আমি, তোমাদের মাতা!'

কচ উপহাসের হাসি হেসে বললেন, 'ভুলে যাবেন না, আপনি আমার বিমাতা।"

কুমারদেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'উত্তম। কিন্তু জেনে রাখো কচ, তোমার সৈন্যদের এ ঘরে ঢুকতে হবে আমার মৃতদেহ মাড়িয়ে!'

কচ বললেন, শুনুন মহারানি, আমি এই শেষবার অনুরোধ করছি, হয় পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান, নয়। চন্দ্রপ্রকাশকে আমাদের হাতে এখনই সমর্পণ করুন।

—চন্দ্রপ্রকাশ এ ঘরে নেই।"

—'মিথ্যা কথা!' তীব্রস্বরে কুমারদেবী বললেন, 'কী! কার সঙ্গে কথা কইছ সে কথা কি তুমি ভুলে গিয়েছ? হতভাগ্য পুত্র, তুমি কি জানো না পবিত্র লিচ্ছবি রাজবংশে আমার জন্ম, স্বর্গীয় মহারাজা পর্যন্ত চিরদিন আমার বংশমর্যাদা রক্ষণ করে চলতেন? এত স্পর্ধা তোমার, আমায় বলো মিথ্যাবাদী? তুমি কী ভাবিছ, চন্দ্রপ্রকাশ এখানে থাকলে আমার এই অপমান সে সহ্য করত?

হা হা করে হেসে উঠে। কচ বললেন, অপমান সহ্য করা. ছাড়া তার আর উপায় কী—

আমার সৈন্যদের হাতে হাতে জ্বলছে শাণিত তরবারি!..নারী, নারী, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও, আমার ধৈর্যের উপরে আর অত্যাচার কোরো না!"

প্রধানমন্ত্রী ভয়ে ভয়ে বললেন, "মহারানি, আপনি সরে আসুন, ওরা এসে দেখে যাক রাজকুমার ঘরের ভিতরে আছেন কিনা!

গর্বিত, দৃঢ় স্বরে কুমারদেবী বললেন, না, না মন্ত্রীমশাই, মহারাজের পবিত্র দেহ যেখানে আছে, এই হিংস্র পশুদের সেখানে আমি কিছুতেই পদার্পণ করতে দেব না। আমার স্বামীর, আমার দেবতার গায়ে পড়বে কুকুরের ছায়া? অসম্ভব!

কচ কঠোর স্বরে বললেন, সৈন্যগণ, এই নারীকে তোমরা বন্দি কর!

পিছন থেকে সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর জাগল, দাদা, কাকে তুমি বন্দি কররবে?

সচমকে ফিরে কচ সবিস্ময়ে দেখলেন, বিস্তৃত অলিন্দের উপরে এসে আবির্ভূত হয়েছেন চন্দ্রপ্রকাশ এবং তঁর পিছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একদল লিচ্ছবি সৈন্য! প্রত্যেক সৈন্যের মস্তকে ও দেহে শিরস্ত্রণ বর্ম, হাতে বর্শা, কোমরে তরবারি।

কুমারদেবী সভয়ে বলে উঠলেন, ‘চন্দ্রপ্রকাশ, চন্দ্রপ্রকাশ। তুমিও আমার কথার অবাধ্য? হা অদৃষ্ট, মহারাজের শেষ নিশ্বাস—বায়ু হয়ত এখনও এখান থেকে লুপ্ত হয়নি, এর মধ্যেই রাজবাড়ির সমস্ত রীতিনীতি বদলে গেল? বেশ, তাহলে তোমরা দুই ভাই মিলে যত খুশি হানাহানি রক্তারক্তি করো, সে দৃশ্য আমি আর স্বচক্ষে দেখব না। কিন্তু দয়া করে একদিন তোমরা অপেক্ষা করো, ভ্রাতৃবিরোধ দেখবার আগেই মহারাজের সঙ্গে আমি সহগমন করতে চাই!’

চন্দ্রপ্রকাশ ব্যথিত স্বরে বললেন, মা, মা, তুমিও আমাকে ভুল বুঝে না মা! আমি তোমার অবাধ্য ছেলে নই!

—অবাধ্য ছেলে নও? তবে কেন তুমি আবার এখানে ফিরে এলে?”

—মা, বাধ্যতারও কি একটা সীমা নেই? লিচ্ছবি সৈন্যদের সঙ্গে আমি তো গঙ্গাপার হয়ে বৈশালী রাজ্যের দিকে যাত্রা করেছিলুম। কিন্তু যেতে যেতে হঠাৎ আমার ভয় হল, মগধের রাজবাড়িতে হয়ত তোমার জীবনও আর নিরাপদ নয়। লিচ্ছবি সেনাপতিও সেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাই আমি ফিরে এসেছি আর দেখছি যে আমার ভয় অমূলক নয়।

—অন্যায় করেছ চন্দ্রপ্রকাশ, অন্যায় করেছ। আমার মতো তুচ্ছ এক নারীর জন্যে তুমি কি স্বদেশের প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করবে না, নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে? শ্রীরামচন্দ্র যেদিন পিতার কাছে নিজের প্রতিজ্ঞা করবার জন্যে অরণ্যে যাত্রা করেন, সেদিন কিমা কৌশল্যার দুই চোখ শুকনো ছিল? কিন্তু মায়ের চোখে অশ্রু দেখে শ্রীরামচন্দ্র কি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিলেন?

চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, প্রতিজ্ঞা আমি ভুলিনি মা, আমি কেবল তোমাকে রক্ষা করতে এসেছি।

—আমাকে রক্ষা করতে এসে যদি তোমার প্রাণ যায়, তাহলে কে সফল করবে। আমার স্বামীর সারা জীবনের সাধনা, কে প্রতিষ্ঠিত করবে। একচ্ছত্র স্বাধীন ভারতে সনাতন আর্য আদর্শ?

—মা, আর তুমি আমার বিপদের কথা ভেবে ভয় পেও না। ফেরবার পথে স্বচক্ষে দেখেছি, সমস্ত পাটলিপুত্রের প্রজারা দলে দলে ছুটে আসছে প্রাসাদের দিকে—সকলেই করছে আমার নামে জয়ধ্বানি! দাদার পক্ষে আছে প্রাসাদের কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক রক্ষসৈন্য মাত্র! এখানে দাঁড়িয়ে সেই হতভাগ্যরা তোমাকে কেবল ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু সারা পাটলিপুত্রের সামনে তারা ভেসে যাবে বন্যার তোড়ে খড়কুটোর মতো!

কচ এতক্ষণ অবাক হয়ে সব শুনছিলেন। এতক্ষণ পরে তিনি আবার চিৎকার করে বললেন, আক্রমণ করো, আক্রমণ করো! সৈন্যগণ, চন্দ্রপ্রকাশকে বন্দি করো—বধ করো! একমাত্র চন্দপ্রকাশই হচ্ছে আমাদের পথে কণ্টকের মতো, ও কাঁটা তুলে ফেললেই সমস্ত পাটলিপুত্র আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে!' এই বলেই তিনি নিজের খাপ থেকে তরবারি খুলে ফেললেন!

চন্দ্রপ্রকাশও নিজের অসিকে কোষমুক্ত করে বললেন, দাদা, তুমি ভুলে যাচ্ছ, এখন আমি আর একলা নাই! আমি যখন প্রাসাদে ফিরে আসি, তখনও তোমার অনুচররা অস্ত্র নিয়ে আমাকে বাধা দিতে এসেছিল। কিন্তু তারা এখন রক্তাক্ত মাটির উপরে শুয়ে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে!

কচ তরবারি তুলে এগুতে এগুতে আবার বললেন, আক্রমণ করো! হত্যা করো!" কুমারদেবী ছুটে গিয়ে দুই দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, ক্ষান্ত হও, তোমরা ক্ষান্ত হও!

আচম্বিতে প্রাসাদের বাইরে জাগল সমুদ্র—নির্ঘোষের মতো এমন গভীর কোলাহল যে, সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিস্ময়ে চমৎকৃত হয়ে! তারপরেই শোনা গেল অসংখ্য অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার, ভয়াবহ গর্জন, প্রচণ্ড চিৎকার, বিষম আর্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কণ্ঠে জয়—নিনাদ!

প্রধানমন্ত্রী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, পাটলিপুত্রের প্রজারা প্রাসাদ আক্রমণ করেছে, তারা সিংহদ্বার ভেঙে আঙিনায় ঢুকেছে, যুবরাজ

চন্দ্রপ্রকাশের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, প্রাসাদের অনেক প্রহরীর প্রাণ গিয়েছে, অনেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে!

কুমারদেবী কঠিন স্বরে বললেন, অপূর্ব ঘরের ভিতরে মগধের মহারাজের মৃতদেহ, ঘরের বাইরে মগধের রাজপুত্ররা পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদ করতে উদ্যত, প্রাসাদের বাইরে মগধের প্রজারা বিদ্রোহী, প্রাসাদের ভিতরে মগধের সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতক! অপূর্ব! মগধের ভবিষ্যৎ কী উজ্জ্বল! কাচ, চন্দ্রপ্রকাশ, এখনও কি তোমাদের রক্ত তৃষা শান্ত হয়নি?

চন্দ্রপ্রকাশ তরবারি নামিয়ে বললেন, মা, আমি তো কারুকে আক্রমণ করতে চাই না।

—তাহলে শীঘ্র প্রাসাদের বাইরে গিয়ে প্রজাদের শান্ত করে এসো।

—তোমাকে এইখানে একলা রেখে?

—হাঁ শীঘ্র যাও! এখনও ইতস্তত করছ? যাও!

চন্দ্রপ্রকাশ দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

কুমারদেবী ফিরে শান্ত স্বরে বললেন, বৎস কচ, দেখছ, রাজ্যলোভে তুমি কী সর্বনাশের আয়োজন করেছ?

কচ নীরবে মাথা নত করলেন।

—শোনো কচ। মহারাজের নিজের হাতে গড়া এত বড়ো রাজ্য যদি ভ্রাতৃবিরোধের ফলে ছারখার হয়ে যায়, তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আমার কল্পনায় আসে না। তুমি পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসতে চাও? বেশ, তোমার বাসনাই পূর্ণ হোক। আমাদের কেবল কিছুদিন সময় দাও, মহারাজের অন্ত্যোষ্টি আর পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ হোক—তারপর তুমি করবে রাজ্যশাসন, আর আমরা যাব নির্বাসনে!

কচ সন্দেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, নির্বাসনে?

—হাঁ, আমি যাব আমার পিতৃরাজ্যে ফিরে, আর চন্দ্রপ্রকাশ যাবে তার প্রতিজ্ঞাপালনের পথে পাটলিপুত্র ছাড়া পৃথিবীতে আরও অনেক রাজ্যের—আরও অনেক সিংহাসনের অভাব নেই। এ বসুন্ধরা হচ্ছে বীরের ভোগ্য, আমার পুত্র বীর!”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বাহু কারুর শক্ত হলেই
বীর—বাহু তো বলব না।
বীরত্ব দেয় আত্মা কেবল;—
এ নয় আমার কল্পনা!

মহারানি কুমারদেবী ফিরে গেলেন তাঁর পিতৃরাজ্য বৈশালীতে। চন্দ্রপ্রকাশ ধরলেন অযোধ্যার পথ। সঙ্গে তাঁর এক হাজার লিচ্ছবি সৈন্য। পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা দলে দলে এসে তাঁর পথ জুড়ে দাঁড়াল। সাশ্রুনেত্রে তারা আবেদন জানালে—যুবরাজ, আমাদের ত্যাগ করে কোথায় চললে তুমি? সিংহাসন গ্রহণ না করো, আমাদেরও তোমার নির্বাসনের সঙ্গী করে নাও!

জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন বসুবন্ধু—তাঁর প্রশান্ত মুখ স্নিগ্ধ হাসির আভায় সুমধুর। তাঁকে দেখেই চন্দ্রপ্রকাশ ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন।

বসুবন্ধু দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, বৎস, মগধের সিংহাসনকে রাজ্যলোভে তুমি যে রক্তাক্ত করে তুললে না, এজন্যে আমার আনন্দের সীমা নেই। মানুষের তরবারি বড়ো নয়, বড়ো হচ্ছে মানুষের আত্মাই! আসল যোদ্ধা বলি আমি তাকেই, আত্মার শক্তিতে যিনি দিগ্বিজয় করতে পারেন।”

শক্তিতেই দিগ্বিজয় করেছিলেন, তার হাতে ছিল না বটে তরবারি। কিন্তু আপনি কি বলতে চান, আত্মার শক্তি না থাকলে কেউ তরবারি ধারণ করতে পারে? অর্জ্জুন যখন সশস্ত্র হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন তখন কি তাঁর আত্মা ছিল দুর্বল? বাহু তো বীরেরও আছে ভীরুরও আছে—কিন্তু সত্যিকার তরবারি চালনা করে কে? বাহু, না আত্মা?...না গুরুদেব, আমি সিংহাসন ত্যাগ করলুম। বটে, কিন্তু তরবারি ত্যাগ করিনি! এখন এই তরবারিই আমার একমাত্র সম্বল!

এই তরবারি হাতে করেই এখন আমি জীবনের গহনবনে নিজের পথ কেটে নিতে চাই!'

বসুবন্ধু বিস্মিত স্বরে বললেন, বৎস, তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না!

চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, প্রভু, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে পিতা আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন 'পাটলিপুত্রের সিংহাসন পেয়ে তোমার প্রথম কর্তব্য হবে, দিগ্বিজয়ীর ধর্ম পালন করা, স্বাধীন ভারতে আবার আর্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা'!

—কিন্তু চন্দ্রপ্রকাশ, পাটলিপুত্রের সিংহাসন তো তুমি গ্রহণ করনি?

—গ্রহণ করিনি মায়ের আদেশে, গুরুদেব! কিন্তু পিতা বলেছেন আমাকে কাপুরুষ সংহার, যবন দমন করতে, ফিরিয়ে আনতে স্বাধীন ভারতে আবার ক্ষত্র যুগকে! তাই আমি চলেছি আজ পিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করতে!

হঠাৎ পিছন থেকে নারীকণ্ঠে শোনা গেল, চন্দ্রপ্রকাশ, চন্দ্রপ্রকাশ! তোমার পিতা শক্তিমান মহারাজা হয়েও যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করতে পারেননি, রাজ্যহারা সহায়হীন তুমি কেমন করে তা সফল করবে?

চন্দ্রপ্রকাশ পিছন ফিরে দেখলেন, ইতিমধ্যে পদ্মাবতী কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু হেসে বললেন, পদ্মা, এইমাত্র গুরুদেব বলছিলেন আত্মার শক্তিতে দিগ্বিজয় করবার জন্যে। সেই আত্মার শক্তি আমার আছে বলেই মনে করি। হতে পারি। আমি সহায়সম্পদহীন—

চন্দ্রপ্রকাশকে বাধা দিয়ে জনতার বহু কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল, না, না, যুবরাজ! আমরা আপনার সহায় হব—আমরা সঙ্গে যাব!

চন্দ্রপ্রকাশ উচ্চৈস্বরে বললেন, বন্ধুগণ, একি তোমাদের মনের কথা?

—মনের কথা যুবরাজ, মনের কথা! আমরা আপনি ছাড়া আর কারুকে মানব না! আপনার জন্যে আমরা প্রাণ দিতে পারি।

চন্দ্রপ্রকাশ মাথা নেড়ে বললেন, কেবল প্রাণ নয় বন্ধুগণ, কেবল প্রাণ নয়! প্রাণের চেয়ে বড়ো হচ্ছে মানুষের আত্মা—দেশের কাজে, জাতির কাছে সেই আত্মাকে তোমরা দান করতে পারবে?

--যুবরাজ, আমাদের আত্মা, আমাদের ইহকাল, আমাদের পরকালই সমস্তই আমরা দান করব!

গভীরস্বরে চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, তাহলে সমুজ্জ্বল এই ভারতের ভবিষ্যৎ! বন্ধুগণ, বুঝতে পারছি আমাদের মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, পাটলিপুত্রের ক্ষুদ্র সিংহাসন তা ধারণ করতে পারবে না—এর জন্যে দরকার মহাভারতের মহাসিংহাসন! গুরুদেব, তাহলে এখন আমাকে বিদায় দিন!

বসুবন্ধু উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, চন্দ্রপ্রকাশ, কোনও কাজ করবার আগে ভেবে দেখা উচিত!

চন্দ্রপ্রকাশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, আর আমি ভাবনার ধার ধারি না গুরুদেব! বাড়িতে যখন আগুন লাগে তখন কেউ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে না।——তখন চাই, কাজ! ভারত জুড়ে আজ আগুন লেগেছে—যবনের অত্যাচারের আগুনে ভারতের মন্দির, মঠ, তপোবন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, শত শত কাপুরুষ রাজা অধর্মের আগুন জেলে ভারতের নিজস্ব সমস্ত পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। এখন নেভাতে হবে সেই প্রচণ্ড আগুন! কিন্তু নদীর জলে নয়—চোখের জলেও নয়, সে ভারতব্যাপী আগুন নিভবে কেবল রক্তসাগরের ভীষণ বন্যায়!”

বসুবন্ধু আহত কণ্ঠে বললেন, ‘রক্তসাগরের বন্যায়? আমার প্রেমের শিক্ষা সব ভুলে গেলে চন্দ্রপ্রকাশ?

—ভুলিনি গুরুদেব, ভুলিনি! যে আকাশে থাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, সেখানেই দেখা দেয় উল্কা আর ধূমকেতু! কিন্তু উল্কাকে পেয়ে আকাশ কি চাঁদের মুখ ভুলে যেতে পারে? ভারতব্যাপী রক্তসাগরে মরব বলে আমরা ডুব দেব না, সাঁতার কেটে উঠব। আবার শ্যামল তীরে! ...বন্ধুগণ!

হাজার হাজার কণ্ঠ সাড়া দিলে—যুবরাজ!

—এখন কিন্তু রক্ত চাই, কেবল রক্ত! কেবল অত্যাচারী, কাপুরুষের, যবনের রক্ত নয়—আমাদেরও বুকের রক্ত! তবেই আমরা পাব পুরনো প্রাণের বদলে নতুন প্রাণ—তবেই আমরা দেখব জীর্ণতার ধ্বংসস্তুপের মধ্যে নতুন সৃষ্টি! ধরে তরবারি, গাও মৃত্যু—গান, ডাকো কল্কি—অবতারকে—যুগে যুগে যিনি অধর্মের কবল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন।

দিল তীব্র বিদ্যুৎ—মালা! হাজার হাজার কণ্ঠ বলে উঠল—আমরা মারব—আমরা মরব।

দৃপ্তকণ্ঠে চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, না—না বন্ধু, আজ থেকে আমি আর চন্দ্রপ্রকাশ নই। আজ এইখানে দাঁড়িয়ে আমার স্বর্গীয় পিতার নাম নিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভারতের পূর্ব—সমুদ্র থেকে পশ্চিম—সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত নতুন এক স্বাধীন আর্যবর্ত গড়ে তুলব! এ প্রতিজ্ঞা যাতে সর্বক্ষণ মনে থাকে, সেইজন্যে আমি নাম গ্রহণ করলুম—সমুদ্রগুপ্ত!

জনতা বিপুল উৎসাহে বলে উঠলেন—জয়, সমুদ্রগুপ্তের জয়!

সমুদ্রগুপ্ত বললেন, শোনো বন্ধুগণ! আপাতত তোমরা নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যাও, আমিও যাত্রা করি পবিত্র অযোধ্যাধামে! একদিন এই অযোধ্যা ছিল মহাক্ষত্রিয় সূর্যবংশের রাজা শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী। বহুযুগ পরে আবার অযোধ্যার গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে যথাসময়ে আমি তোমাদের আহ্বান করব। ...প্রণাম গুরুদেব! বিদায় পদ্মা!” সমুদ্রগুপ্ত তাঁর ঘোড়ার উপর চড়ে বসলেন। পদ্মাবতী ঘোড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালতার দুই চোখ করছে ছলছল।

সমুদ্রগুপ্ত একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘কী পদ্মা, তোমার মুখ অমান স্নান কেন? চলেছি পিতৃব্রত উদযাপন করতে, তুমি কি হাসি মুখে আমাকে বিদায় দেবে না?

ভাঙা ভাঙা গলায় পদ্মাবতী বললে, চন্দ্রপ্রকাশ—

—আর চন্দ্রপ্রকাশ নাই পদ্মা, সমুদ্রগুপ্ত!

—না চন্দ্রপ্রকাশ, না! যে নাম ধরে তুমি রক্তসাগরে সাঁতার কাটতে চাও, সে নামে আমি তোমাকে ডাকতে পারব না। আমার কাছে চিরদিন তুমি চন্দ্রপ্রকাশই থাকবে!

—বেশ, তাই ভালো পদ্মা! এখন পথ আমাকে ডাক দিয়েছে, আর সময় নেই। তুমি কি বলতে চাও, বলো।

চন্দ্রপ্রকাশ, এতদিন তোমার সঙ্গে লেখাপড়া শিখেছি, গল্প—খেলা করেছি, গান গেয়েছি, বাঁশি বাজিয়েছি। আর আজ তুমি একেবারেই আমাকে ফেলে চলে যাবে?

—'ভয় নেই পদ্মা, ভয় নেই! কর্তব্য শেষ করে আবার আমি ফিরে আসব, আবার বাঁশি বাজাব, আবার গান শুনব। বিদায়—' সমুদ্রগুপ্ত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। তাঁর পিছনে পিছনে ছুটিল এক হাজার লিচ্ছবি সওয়ার!

ঘোড়ার পায়ের ধুলো যখন দূরে মিলিয়ে গেল, পদ্মাবতী তখনও শূন্যদৃষ্টিতে পথের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খানিকক্ষণ পরে তার দুই চোখ উপছে অশ্রু ঝরতে লাগল। বসুবন্ধু এগিয়ে এসে মমতাভরে মেয়ের মাথার উপরে হাত রেখে ধীরে ধীরে বললেন, মিছেই। তুই কাঁদছিস পদ্মা! সিংহের শাবক। শুনেছে বনের ডাক, ঘরোয়া স্নেহ দিয়ে আর ওকে ধরে রাখতে পারবি না।"

পিতার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পদ্মাবতী বললে, বাবা, পাটলিপুত্রে আর আমি থাকতে পারব না!

—আমিও পারব না। মা, আমিও পারব না! কচের রাজ্যে বাস করার চেয়ে অরণ্যে বাস করা ভালো!

—তবে আমরাও অযোধ্যায় যাই চলো।

—অযোধ্যায়! কেন, সেখানে চন্দ্রপ্রকাশ আছে বলে? কিন্তু শুনলি তো, দুদিন পরে অযোধ্যা ছেড়ে সে দিগ্বিজয়ে বেরুবে?

—তবু অযোধ্যাই ভালো, বাবা! আরও দুদিন তো চন্দ্রপ্রকাশের সঙ্গে থাকতে পারব?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নরম বটে নারীর বাহু;
সেই বাহুতেই বন্দি রাহু!

—সৈন্যগণ! আজি তোমরা যে পবিত্র পুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেছ, এর চেয়ে স্মরণীয় নগর ভারতে আর দ্বিতীয় নেই! এ হচ্ছে অযোধ্যাধাম—মহারাজা দিলীপ, রঘু, ভগীরথ, রামচন্দ্রের লীলাভূমি! এরই কীর্তিগাঁথা উচ্চারণ করে মহাকবি বাল্মীকি আজ অমর হয়েছেন। আমি পাটলিপুত্রের ছেলে, আমার সামনে জাগছে বটে। মগধের দিগ্বিজয়ী চন্দ্রগুপ্তের আদর্শ, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সামনে ছিল পৃথিবীজয়ী রঘুরই আদর্শ। তিনি একদিন অযোধ্যারই সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়েছিলেন বিশ্বজয় করতে। তীর অপূর্ব তরবারির অগ্নিজ্বালা দেখে কেবল সমগ্র ভারতই তাকে প্রণাম জানায়নি, তার পায়ের তলায় লক্ষ লক্ষ মাথা নত করেছিল। অভারতীয় যাবনরা পর্যন্ত। তারই পৌত্র শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্ব কাহিনি তোমাদের কাছে আর নতুন করে বলবার দরকার নেই। একদিন এই অযোধ্যা ছিল আসমুদ্র—হিমাচলের অধিশ্বরী, আজ আমরাও আবার তার পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনতে চাই! সম্রাট রঘুর পদচিহ্নই হবে আমাদের অগ্রগতির সহায়—উত্তর—দক্ষিণ—পূর্ব—পশ্চিমের সর্বত্রই পড়বে আমাদের তরবারির ছায়া! অযোধ্যার রঘু করেছিলেন পৃথিবী বিজয়, অযোধ্যার রামচন্দ্র করেছিলেন ভারত ও লঙ্কা জয়, আর আজ অযোধ্যার সমুদ্রগুপ্তও করতে চায় সমগ্র আর্যবর্ত জয়! আমরা আদর্শচ্যুত হিন্দু কাপুরুষ বধ করব, স্বদেশের শত্রু যবন বধ করব, অত্যাচারী শক বধ করব,—উত্তপ্ত রক্তবাদলের ধারায় আর্যবর্তের আহত আত্মার উপর থেকে বহুযুগের সঞ্চিত কলঙ্কের চিহ্ন মুছিয়ে দেব! কিন্তু মনে রেখো ভারতের সন্তানগণ! এ হচ্ছে অতি কঠোর ব্রত! এ ব্রত উদযাপন করতে গেলে তোমাদের সকলকেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে হবে—শত্রুর রক্তের সঙ্গে

মেশাতে হবে তোমাদের নিজেদের দেহের রক্ত। আমি মৃত্যুপণ করেছি, তোমাদেরও করতে হবে মৃত্যুপণ। তোমাদের অনেকেই আর দেশে ফিরে আসতে পারবে না, এটা জেনেও তোমরা কি আমার সঙ্গে যাত্রা করতে রাজি আছ?

আকাশ কাঁপিয়ে বিরাট জনতার মধ্যে দৃপ্ত স্বর জাগল—মৃত্যুপণ, মৃত্যুপণ! আমরা মৃত্যুপণ করলুম! জয়, মহাবীর সমুদ্রগুপ্তের জয়!

প্রকাণ্ড প্রাসাদ। প্রভাত সূর্যের প্রখর কিরণে প্রসাদের অমল শুভ্রতা জ্বলছে যেন জুল জুল করে। অলিন্দের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন সমুদ্রগুপ্ত—পরণে তাঁর যোদ্ধার বেশ, হস্তে তাঁর মুক্ত কৃপাণ!

প্রাসাদের সামনেই মস্ত একটি ফর্দ জায়গা পরিপূর্ণ করে যে বিপুল জনতার সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে কত হাজার লোক আছে আন্দাজে তা বলা অসম্ভব। তার মধ্যে অশ্বারোহী আছে, গজারোহী আছে, রথারোহী আছে, পদাতিক আছে, সে জনতার মধ্যে সুসজ্জিত সৈনিক ছাড়া আর কারুর স্থান হয়নি।

তিনমাস ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় সমুদ্রগুপ্ত এই বৃহৎ বাহিনী সংগ্রহ করেছেন এবং আজ তার সৈন্য পরিদর্শনের দিন।

এতক্ষণ ধরে তিনি জ্বলন্ত ভাষায় সৈন্যদের উত্তেজিত করছিলেন, এখন তাদের মুখে মৃত্যুপণের কথা শুনে সমুদ্রগুপ্তের ওষ্ঠধরে ফুটে উঠল প্রসন্ন হাসি।

তিনি আবার উচ্চকণ্ঠে বললেন, সৈন্যগণ, তোমরা আমার সাধুবাদ গ্রহণ করো। দিগ্বিজয় করবে তোমরাই, আমি কেবল তোমাদের পথপ্রদর্শক মাত্র। তোমাদের সাজসজ্জা, নিয়মানুবর্তিতা দেখে আমি অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছি, আর তোমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শুনে বুঝতে পারছি, আমার আদর্শ তোমরা গ্রহণ করতে পেরেছ। আর এক সপ্তাহ পরেই তোমাদের সঙ্গে হবে। আমার যাত্রা শুরু। আজ আমার আর কোনও বক্তব্য নেই। তোমরা এখন সৈন্যাবাসে ফিরে যাও।

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকদের মধ্যে জাগ্রত হল গতির চাঞ্চল্য। শোনা গেল সেনাপতিদের উচ্চ আদেশবাণী।.দলে দলে বিভক্ত হয়ে শ্রেণিবদ্ধ সৈন্যরা

ফিরে চলল সেনাবাসের দিকে—শত শত পতাকাদণ্ডে, রথচূড়ায় এবং হাজার হাজার বর্শায় শূন্য হয়ে উঠল কণ্টকিত! সমুদ্রগুপ্ত গর্ব—প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাঁর সযত্নে সংগৃহীত বাহিনীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তারা সকলে যখন অদৃশ্য হল, তিনি তখন ধীরে ধীরে অলিন্দ ছেড়ে প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করলেন এবং পোশাক ছাড়বার জন্যে গেলেন নিজের ঘরের ভিতর।

ঘরে ঢুকে দেখলেন, গবাক্ষের কাছে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে পদ্মাবতী। শুধোলেন, পদ্মা, তুমি এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে পদ্মা প্রশ্ন করলে, চন্দ্রপ্রকাশ, তুমি এঘর থেকে কখন বেরিয়ে গিয়েছ?

—সূর্যোদয়ের আগে। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছি কেন?

—তাহলে তুমি যাবার পরে এ ঘরে অন্য কেউ ঢুকেছিল।

—আশ্চর্য কী, ভৃত্যরা—

ভৃত্য নয় চন্দ্রপ্রকাশ, ভূত্য নয়। ভৃত্যরা উদ্যানের ভিতর থেকে গবাক্ষপথ দিয়ে কাদামাখা পায়ে ঘরের ভিতরে ঢোকে না। এই দ্যাখো—

সমুদ্রগুপ্ত বিস্মিত চোখে দেখলেন, গবাক্ষের কাছ থেকে একসার কর্দমাক্ত পদচিহ্ন বরাবর তার শয্যার কাছ পর্যন্ত চলে গিয়েছে এবং আর একসার পদচিহ্ন আবার ফিরে এসেছে গবাক্ষের কাছে।

—দেখছ চন্দ্রপ্রকাশ? গবাক্ষ দিয়ে কেউ ঘরের ভিতরে ঢুকে আবার গবাক্ষপথেই উদ্যানের ভিতরে ফিরে গিয়েছে! কাল রাতে বৃষ্টি পড়েছিল বলেই সে তার কর্দমাক্ত পদচিহ্ন গোপন করতে পারেনি। কিন্তু কে সে?

সমুদ্রগুপ্ত হাস্য করে বললেন, চোর এসেছিল পদ্মা! কিন্তু এ ঘরে ধনরত্ন না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে!..উদ্যানে ও কে ভ্রমণ করছে? কবি হরিসেন? পদ্মা, এই নাও আমার তরবারি। আর ধনুক—বাণ, কবির সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি।

—কিন্তু চন্দ্রপ্রকাশ, এই সাহসী চোরের কথা এত সহজে তুমি উড়িয়ে দিও না--

—'পদ্মা, ও—জন্যে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যাদের চোর ধরা ব্যবসা তাদের খবর দাও'—বলতে বলতে সমুদ্রগুপ্ত ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হলেন।

উদ্যানের ভিতরে গিয়ে সমুদ্রগুপ্ত দেখলেন, হরিসেন একটি লতাকুঞ্জের ছায়ায় মর্মরবেদির উপরে বসে আছেন।

তাকে দেখে হারিসেন সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠতেই সমুদ্রগুপ্ত বললেন, বসো কবি, বসো। আমি এসেছি তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ কাব্যচর্চা করতে।

হরিসেন বললেন, রাজকুমার, আমার কবিতা আজ পলাতক!

—পলাতক কেন?

"যুদ্ধের দামামা শুনে আমার কবিতা আজ ভয় পেয়েছে।

—কবিতা ভয় পেয়েছে। যুদ্ধের দামামা শুনে? ভুল কবি, ভুল। কবিতা কি কেবল কোমল? তার বুকে কি বজ্রের আগুন বাস করে না? ক্রৌঞ্চ পাখির মৃত্যু—ব্যথায় বাল্মীকির যে কবিতা হয়েছিল কেঁদে সারা, বীরবার রামচন্দ্রের সঙ্গে সেও কি শত শত যুদ্ধযাত্রা করে অস্ত্র ঝনঝনার ছন্দে ছন্দে নৃত্য করতে পারেনি? হরিসেন, বন্ধু! যোদ্ধারা কেবল অস্ত্র ধরতে পারে, কিন্তু দেশ জাগাবার মন্ত্র শোনাবে তোমরাই। দেশ না জাগলে অস্ত্র ধরে কোনও লাভ নেই। শোনো কবি, তুমি প্রস্তুত হও,—আমার সঙ্গে তুমিও যাবে দিগ্বিজয়ে!

বিস্ময়ে অভিভূত স্বরে হরিসেন বললেন, আমিও যাব দিগ্বিজয়ে! রাজকুমার, লেখনী চালনা করে আমি কি শত্রু বধ করতে পারি?

—তরবারি চালনা করে মানুষ মারা যায় বটে, কিন্তু লেখনী চালনা করে তোমরা মানুষকে অমর করতে পার! বাল্মীকির কাব্যই আজও রামচন্দ্রকে জীবন্ত করে রেখেছে। বন্ধু, আমি চাই তুমিও আমার দিগ্বিজয় স্বচক্ষে দেখে বর্ণনা করো!

যদি সফল হই তোমার কাব্যের প্রসাদে আমিও অমর হয়ে থাকিব যুগ—যুগান্ত পর্যন্ত! কবি,—

হঠাৎ পিছনে এক আর্তনাদ উঠল, সমুদ্রগুপ্ত ও হরিসেন দুজনেই সচমকে ফিরে দেখলেন, একটা মনুষ্য—মূর্তি উদ্যান—পথে পড়ে বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করছে! সমুদ্রগুপ্ত তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সে মূর্তি নিস্পন্দ! হরিসেন বললেন, রাজকুমার, এর বুকে বিঁধে রয়েছে একটা তির!

সমুদ্রগুপ্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, আমার উদ্যানে নরহত্যা। কে এ কাজ করলে?

—আমি করেছি। চন্দ্রপ্রকাশ, তোমারি ধনুকে বাণ জুড়ে আমি একে হত্যা করেছি।

সমুদ্রগুপ্ত বিপুল বিস্ময়ে দেখলেন, একটা গাছের আড়াল থেকে ধনুক—হাতে বেরিয়ে এল পদ্মাবতী!

--পদ্মা!

—বিস্মিত হচ্ছে কেন চন্দ্রপ্রকাশ? তুমি কি ভুলে গিয়েছ ধনুর্বিদ্যা শিখেছি আমি তোমার কাছ থেকেই?

—ভুলিনি। এও জানি তোমার লক্ষ অব্যর্থ। কিন্তু তুমি লক্ষ করতে কেবল গাছের ফুল আর ফলকে। তোমার বাণে কোনওদিন একটা পাখি পর্যন্ত মরেনি, আর আজ তুমি করলে কিনা নরহত্যা!

—এজন্যে আমি দুঃখিত বটে, কিন্তু কী করব বলো চন্দ্রপ্রকাশ? তোমার শয়নগৃহের গবাক্ষ থেকে দেখতে পেলুম, এই লোকটা চোরের মতো পা টিপে টিপে একখানা শাণিত ছোরা নিয়ে তোমার পিছনে পিছনে আসছে। তখনই তোমার, ধনুক,বাণ নিয়ে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলুম। তারপর যখন তোমাকে লক্ষ্য করে লোকটা অস্ত্র তুললে, আমাকেও বাধ্য হয়েই বাণ ত্যাগ করতে হল!

—গুপ্তঘাতক! তাহলে এরই পদচিহ্ন দেখেছি আমার ঘরে! পদ্মা—পদ্মা, তুমিই আমার জীবন রক্ষা করলে! তখন এ কথা—

সমুদ্রগুপ্তের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল, প্রাসাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে সৈনিক বেশধারী এক পুরুষ বেগে দৌড়ে আসছে, তার সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত!

সমুদ্রগুপ্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, মগধ—সেনানী মহানন্দ?

মহানন্দ কাছে এসে জান পেতে বসে পড়ে বললে, জয় মগধের মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের জয়! তাহলে আমি ঠিক সময়েই আসতে পেরেছি!

—মহানন্দ, মগধের মহারাজা হচ্ছেন আমার দাদা।

—কচ এখন পরলোকে। মন্ত্রীরা তাকে হত্যা করেছেন।

—হত্যা করেছেন!

—আঞ্জে হ্যাঁ মহারাজ! একে তো কচের অত্যাচারে এরই মধ্যে রাজ্যময় হাহাকার উঠেছিল, তার উপরে মন্ত্রীরা চরের মুখে খবর পান যে আপনাকে হত্যা করবার জন্যে কচ এক গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছেন। তাই শুনে মন্ত্রীরা ক্রুদ্ধ হয়ে কচকে হত্যা করে আপনাকে সাবধান করবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—ওইদিকে চেয়ে দ্যাখো মহানন্দ, সেই ঘাতক এখন নিজেই নিহত! আমার বান্ধবী পদ্মাবতী ওর কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন। এদিকে এগিয়ে এসো বান্ধবী, তোমাকে একবার ভালো করে দেখি! বন্ধু হরিসেন, নারীও কি তোমার কবিতার মতো কোমল নয়?

পদ্মাবতী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে বললে, চন্দ্রপ্রকাশ, তোমার ধনুক ফিরিয়ে নাও।

মহানন্দ বললে, মহারাজ, মগধের সিংহাসন খালি। এখন আপনাকে যে পাটলিপুত্রে প্রত্যাগমন করতে হবে!

সমুদ্রগুপ্ত বললেন, অসম্ভব! তুমি কি শোননি মহানন্দ, স্বগীয় পিতৃদেবের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর্যবর্ত জুড়ে স্বাধীন ভারত—সাম্রাজ্য স্থাপন না করে পাটলিপুত্রে আর ফিরে আসব না?

—তাহলে রাজ্যচালনা করবে কে?

— আমার মাতা মহারানী কুমরাদেবী, আমার আমার গুরুদেব বসুবন্ধু।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একতা, একতা, একতা!
একতার জোরে মানুষের কাছে
হারে যে দানব—দেবতা ।

তারপর এক বৎসর কেটে গেছে। এই এক বৎসর ধরে সমুদ্রগুপ্তের রক্তপতাকা দেখা দিয়েছে আর্যবর্তের অর্থাৎ উত্তর ভারতের দেশে দেশে ।

আগেই বলেছি। উত্তর ভারত ভাগ করে নিয়েছিল ছোটো ছোটো হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ভারতীয় রাজারা এবং শক, হুন ও গ্রিক প্রভৃতি যাবনরা। খাঁটি ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বীরত্বের অভাব ছিল, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু বৃহত্তর শত্রুর আবির্ভাব হলে এক এক লড়বার ক্ষমতা না থাকলেও তারা একত্রে দলবদ্ধ হতে জানতেন না।

এই বিপজ্জনক স্বভাবটা হচ্ছে একেবারেই ভারতের নিজস্ব। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এই কুস্বভাবের জন্যে ভারতবর্ষ বার বার বিদেশি শত্রুর করতলগত হয়েছে। এ স্বভাব না থাকলে ভারতবর্ষের শিয়রে আজও যে ব্রিটিশ সিংহের গর্জন শোনা যেত না, একথা জোর করে বলা যায়।

ইউরোপের ধারা হচ্ছে স্বতন্ত্র। এই কয়েক শত বৎসর আগেও ইউরোপের বিভিন্ন জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রে দাঁড়িয়ে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বারংবার।

কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত ভারতের ইতিহাসেও একটা ব্যাপার অনেকবার দেখা গিয়েছে। শত শত বৎসর অন্তর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতবর্ষের ক্রন্দন যখন গগনভেদী হয়ে উঠেছে, তখন এখানে অবতারের মতো আবির্ভূত হয়েছেন এক একজন মহামানব। যেমন চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধন। এঁরা প্রত্যেকেই আপনি আপনি ব্যক্তিত্বের অপূর্ব মহিমায় ভারতবাসীদের প্রাণে এনেছেন বিচিত্র প্রেরণা,

এবং জোর করে একতাহীন রাজাদের দমন করে সমগ্র আর্যবর্তকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে বিদেশি শত্রুদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ভারতের ধর্মকাব্যে অমর হয়ে আছে। এ যুদ্ধ কবে হয়েছিল এবং এর ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু সেকথা কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। কিন্তু এ যুদ্ধের ইতিহাস যে ভারতের সত্যিকার স্বভাবের ইতিহাস সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। সমগ্র আর্যবর্ত যেন আত্মহত্যা করবার জন্যেই বদ্ধপরিকর হয়ে কয়েকদিনব্যাপী এক মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধা যতই বীরত্ব প্রকাশ করে থাকুন, তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন তুচ্ছ কারণে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়, তা হচ্ছে ভারতের পক্ষে লজ্জাকর। কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যদি ঐতিহাসিক হয় তবে বলতে হবে যে তার ফলে ভারতের ক্ষাত্র-বীর্য একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল বলেই সেউ সুযোগে হয়তো পারসি ও গ্রিক প্রভৃতি যাবনরা ভরসা করে পঞ্চনদের তীরে প্রথম আগমন করতে পেরেছিল।

কিন্তু একতা—মন্ত্রের যে কত গুণ, ভারতবর্ষ নিজেও একবার সে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল। সে হচ্ছে ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের উপরে ভেঙে পড়ে হুন—যবানদের প্রবল বন্যা। এই হুনদের চেহারা ছিল যেমন রাক্ষসের মতো তাদের প্রকৃতিও ছিল তেমনই ভয়ানক এবং সংখ্যাতেও তারা ছিল অগণ্য। এই হুনদের অন্যতম নেতা আটিলার নাম শুনলে আজও ইউরোপ শিউরে ওঠে। ঐতিহাসিক গিবন তাদের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন—সাধারণ মনুষ্যজাতির সঙ্গে হুনদের চেহারা মেলে না। তাদের দুই কাঁধ খুব চওড়া, নাক খাদা, কুতকুতে কালো চোখ একেবারে কোটরগত, দাড়ি—গোঁফ গজায় না।

ভারতে আটিলার ব্রত নিয়ে এসেছিল মিহিরগুল। লক্ষ লক্ষ সঙ্গী নিয়ে নগ্ন তরবারি খুলে সে সমগ্র আর্যবর্ত জুড়ে প্রলয় নৃত্য করে বেড়িয়েছিল।

রক্তসাগরে ভেসে, গ্রাম—নগর পুড়িয়ে দিয়ে, নারীর উপর অত্যাচার করে ভারতবর্ষকে সে যেন এক মহাশ্মশানে পরিণত করতে চেয়েছিল। সেই সময়ে মধ্য ভারতের এক রাজা যশোধর্মণ বুঝলেন, এখনও ভারতবাসীরা যদি একতার মর্ম গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে আর আর্যবর্তের রক্ষা নেই। যশোধর্মণের যুক্তি শুনে ভারতের অন্যান্য রাজারা সেই প্রথম হিংসা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে একতাবদ্ধ হলেন। তার সুফল ফলতেও দেরি লাগল না। আনুমানিক ৫২৮ খ্রিস্টাব্দে একতাবদ্ধ রাজাদের নিয়ে যশোধর্মণ এমনভাবে মিহিরগুলিকে আক্রমণ ও পরাজিত করলেন। যে হুনদের বিষদাঁত একেবারেই ভেঙে গেল।

কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের কথা সেই যশোধর্মণের আদর্শ এখানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারেনি। এমনই মাটির গুণ!

শক ও হুন প্রভৃতি যাবনরা ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে অভিশাপের মতো। মহাভারতের মহাবীর শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত বারবার তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শ্রান্ত হয়ে শেষটা পশ্চিম ভারতের শেষ প্রান্তে সমুদ্রের ধারে পালিয়ে গিয়ে দ্বারকানগর বসিয়ে নিরাপদ হবার চেষ্টা করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের যুগে যাবনরা বোধহয় খুব বেশি প্রবল বা একতাবদ্ধ ছিল না। তারাও নানা স্থানে আলাদা আলাদা ছোটো বড়ো রাজ্য স্থাপন করে বাস করত।

উত্তর ভারতের এই সমস্ত একতাহীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও যবন রাজা সমুদ্রগুপ্তের ভীষণ আক্রমণে মহাঝড়ে বনস্পতির মতো ধরাতলশায়ী হল। সমুদ্রগুপ্ত তাদের কারুকেই ক্ষমা করলেন না, নিজের সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য সকলের রাজ্যই একে একে নিলেন। অশোকস্তম্ভের গায়ে সমুদ্রগুপ্তের নিকটে পরাজিত প্রধান প্রধান নয়জন উত্তর ভারতীয় রাজার নাম খোদাই আছে বটে, কিন্তু একজন ছাড়া আর কারুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ওই একজনের নাম হচ্ছে গণপতি নাগ, তার রাজধানী ছিল পদ্মাবতী নগরে। সে স্থান এখন মহারাজা সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত।

আজকের দিনে এক রাজা যদি শখ করে অন্যের রাজ্য কেড়ে নেন, তাহলে তার নিন্দার সীমা থাকে না। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের যুগ ছিল প্রবলের যুগ, দুর্বলকে দমন করাই ছিল যেন তখন প্রবলের প্রধান কর্তব্য। সুতরাং আজকের মাপকাঠিতে সমুদ্রগুপ্তকে বিচার করা সঙ্গত হবে না। হিটলার ও মুসোলিনি আজ আবার সেই পুরাতন যুগধর্মকেই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, দুর্বলের উপরে প্রভুত্ব করবার ইচ্ছাটা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ও চিরন্তন ইচ্ছা!

উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত দেশ জয় করে সমুদ্রগুপ্ত আবার অযোধ্যায় ফিরে এলেন। কিন্তু তখনও তাঁর দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা শান্ত হয়নি, কারণ তখনও দক্ষিণ ভারত রয়েছে তার নাগালের বাইরে এবং পিতার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সমগ্র ভারতের উপরে তুলবেন তাঁর গৌরবময় পতাকা!

নবম পরিচ্ছেদ

সুন্দরী সে, সুন্দরী!
চরণ—কমল সন্ধানে তার
মধুপ ওঠে গুঞ্জরি!

বাতাস বহন করে নিয়ে যাচ্ছে শত শত মঙ্গলশঙ্খের সুগভীর আনন্দকল্লোল, জনতার অশ্রান্ত ঐকতানে ঘনঘন বেজে উঠেছে। অনাহত জয়গীতিকা, পথে পথে ঝরে পড়ছে লাজাঞ্জলির পর লাজাঞ্জলি!

বিজয়ী বীর সুদূরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছেন স্বদেশে, প্রাচীন অযোধ্যা তাঁকে অভিনন্দন দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

প্রাসাদ—তোরণে অপেক্ষা করছিলেন রাজমাতা মহারানি কুমারদেবী, রাজগুরু বসুবন্ধু ও রাজবান্ধবী পদ্মাবতী।

প্রণত সমুদ্রগুপ্তকে সানন্দে আশীর্বাদ করে কুমারদেবী বললেন, বাছা, তোমার মতো বীর পুত্র পেয়ে আমার গর্বের আর সীমা নেই। এইবারে মগধের সিংহাসন গ্রহণ করে মায়ের জীবন সার্থক করো।

সমুদ্রগুপ্ত মায়ের একখানি হাত আদর করে নিজের বুকের উপরে টেনে নিয়ে বললেন, সময় হয়নি মা, এখনও সময় হয়নি। প্রতিজ্ঞা করেছি, সমস্ত ভারত যতদিন না আমাকে সম্রাট বলে মানবে, ততদিন মগধের মুকুট দাবি করব না। কেবল উত্তর ভারত নিয়ে আমি খুশি হতে পারব না—আগে দক্ষিণ ভারত জয় করি, তারপর করব মুকুটধারণ।

বসুবন্ধু বললেন, বৎস, সন্ন্যাসীকে করে গেছ তুমি রাজপ্রতিনিধি। কিন্তু আমার সন্ন্যাস যে এ ঐশ্বর্য আর সইতে পারছে না, তার আর্তনাদ যে নিশিদিন আমি শুনতে পাচ্ছি! আমাকে মুক্তি দাও বৎস, মুক্তি দাও!

সমুদ্রগুপ্ত হেসে বললেন, মুক্তি! শিষ্যের স্নেহের রাজ্যে গুরুর মুক্তি যে কোনওদিনই নেই প্রভু! ঐশ্বর্যের মধ্যেও যে সন্ন্যাস নির্লিপ্ত থাকতে পারে, তার চেয়ে গৌরব আছে আর কার? হে রাজতপস্বী শিষ্যের মুখ চেয়ে আরও কিছু দিন রাজ্যপীড়া ভোগ করুন।

পদ্মাবতী ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। সমুদ্রগুপ্ত বললেন, কী সংবাদ, পদ্মা? মাতৃদেবীর আর্তনাদ শুনলুম। এইবারে তোমারও আর্তনাদ শুনতে হবে নাকি?

পদ্মাবতী বললেন, হাঁ চন্দ্রপ্রকাশ! আমার কাছেও এক আর্তনাদ এসেছে, দূর—দূরান্তর থেকে!

—দূর—দূরান্তর থেকে। জীবস্মৃত ভারতের অসাড় চরণে মহাসমুদ্রের মাথা কোটা আর্তনাদ আমার মতো তুমিও কি শুনতে পেয়েছ পদ্মা?

—অত বেশি শোনবার শক্তি ভগবান আমাকে দেননি!

—তবে?

—আমার কাছে এসেছে এক নারীর আর্তনাদ!

—পদ্মা, তোমার কথা শুনে আমি বিস্মিত হচ্ছি!

—মালব—রাজকন্যা দত্তদেবীর নাম শুনেছি?

—মালব—রাজ্য জয় করেছি বটে, কিন্তু রাজকন্যাকে চিনি না।

—দত্তাদেবী যাচ্ছিলেন তীর্থ ভ্রমণে। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে কোশলরাজ মহেন্দ্র পথে তাকে বন্দি করেন। কিন্তু দত্তাদেবীকে নিয়ে তিনি নিজের রাজধানীতে ফেরবার আগেই অরণ্য প্রদেশের রাজা ব্যাঘ্ররাজ তার কাছ থেকে দত্তাদেবীকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।”

—ব্যাঘ্ররাজ? হ্যাঁ, তার নাম আমি জানি। বিষম নিষ্ঠুর, প্রবল পরাক্রান্ত এই বন্য রাজা। এর রাজধর্ম হচ্ছে দস্যুতার অত্যাচার। পদ্মা, মালব—রাজকন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে।

—কেবল দুঃখিত হলেই তো চলবে না চন্দ্রপ্রকাশ! দত্তাদেবী যে সাহায্য চেয়ে তোমার কাছেই দূত পাঠিয়েছেন।

—আমার কাছে! আমি কী করব? আমার চোখের সামনে এখন জেগে আছে খালি মহাভারতের বিরাট মূর্তি। তুচ্ছ এক নারীর আবেদন শোনবার সময় এখন নেই।

কুমারদেবী বললেন, বাছা, আর্য ভারতবর্ষে বীরের বাহুই চিরদিন নারীর ধর্মরক্ষা করে এসেছে, তুমি কি এ আদর্শ মানো না?

—মানি, মা মানি। কিন্তু বৃহত্তর কর্তব্য পালন না করে—

পদ্মাবতী বাধা দিয়ে বললে, চন্দ্রপ্রকাশ, দত্তাদেবীর আবেদন শুনলে তোমার কর্তব্যপালনে কোনওই বাধা হবে না। তুমি তো দক্ষিণাত্যে যেতে চাও? তাহলে অরণ্যপ্রদেশ পড়বে তোমার যাত্রাপথেই। ব্যাঘ্ররাজকে দমন না করে তুমি তো অগ্রসর হতে পারবে না।

সমুদ্রগুপ্ত হেসে বললেন, পদ্মা, আমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে তুমি যে দেখছি, সমস্ত যুক্তিই স্থির করে রেখেছ। বেশ, আমি তোমাদের কথাই শুনব! দত্তাদেবীর দূতকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

অবিলম্বে দূত এসে অভিবাদন করলে।

সমুদ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, দত্তাদেবী এখন কোথায়?

—অরণ্য প্রদেশের এক গিরি দুর্গে তিনি বন্দিনী।

—কোন পথে শীঘ্র সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে পারব?

—দক্ষিণ কৌশলের মহানদীর উপত্যকার ভিতর দিয়ে।

—তাহলে আগে আমাকে কোশল রাজ্যও জয় করতে হবে। কিন্তু দূত, ততদিন দত্তাদেবী আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারবেন কি?

—মহারাজ, দুরাত্মা ব্যাঘ্ররাজ রাজকন্যাকে বিবাহ করবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজকন্যা তার কাছে দুই মাস সময় প্রার্থনা করেছেন, সেও রাজি হয়েছে।

—কোশলরাজ মহেন্দ্র আর ব্যাঘ্ররাজ দুজনেই যখন দত্তাদেবীর জন্যে লালায়িত, তখন বোধ হচ্ছে তোমাদের রাজকন্যা খুবই সুন্দরী?

—অসীম সুন্দরী মহারাজ, সাক্ষাৎ তিলোত্তমা! যেমন রূপ, তেমনই গুণ!

—আচ্ছা, যাও দূত! দত্তাদেবীকে জানিও, দুই মাসের মধ্যেই সমুদ্রগুপ্ত সসৈন্যে ব্যাঘ্ররাজের দর্পচূর্ণ করবে।

দূত চলে গেল। পদ্মাবতী কাছে এসে দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসতে হাসতে চুপি চুপি বললে, চন্দ্রপ্রকাশ, শুনলে তো?

--কী?

—দত্তাদেবী হচ্ছেন সাক্ষাৎ তিলোত্তম।

--হুঁ।

—দত্তাদেবী কুমারী।

--হুঁ।

—তুমিও কুমার।

—পদ্মা, তুমি কী বলতে চাও?

—হয়ত শীঘ্রই তোমাদের বিবাহের ভোজে আমাদের নিমন্ত্রণ হবে।

--পদ্মা!

কিন্তু পদ্মা আর দাঁড়াল না, চঞ্চলা হরিণীর মতো ছুটে পালিয়ে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

মরীচিকা—বিভীষিকা!

কালো অরণ্য!

মানুষের প্রাণ হেথা

অতি নগণ্য!

সে রাজ্যের নাম মহাকান্তার—মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী প্রদেশে তার অবস্থান। তারই রাজা হচ্ছে ব্যাঘ্ররাজ। বাঘ থাকে বনে এবং মহাকান্তার বলতে ভীষণ নিবিড় অরণ্যই বোঝায়। কাজেই রাজার ও রাজ্যের নাম হয়েছে এমন অদ্ভুত।

কিন্তু সাধারণত নিবিড় অরণ্য বললে আমাদের মনে বনের যে ছবি জেগে ওঠে, মহাকান্তারের আসল দৃশ্য তার চেয়েও ভয়ানক। এখানে এসে দাঁড়ালে মনে হবে, সৃষ্টিপ্রভাতের যে পৃথিবীতে মানুষ জন্মায়নি, আমরা যেন সেই পৃথিবীরই কোনও এক অংশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

যেখানে মানুষের বসতি নেই। সেখানকার কথা বলতে গেলে আগে স্তব্ধতার বর্ণনা দিতে হয়। মহাকান্তারেরও অধিকাংশ স্থানে মানুষের কোনও সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু এ অরণ্য—সাম্রাজ্য নিস্তব্ধ নয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নানা জাতের নানা বৃক্ষ সর্বদাই জাগিয়ে রেখেছে মর্মর—গর্জন! পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ঢুকে ঝোড়ো হাওয়া করছে অশ্রান্ত চিৎকার এবং তারপর যেন কাকে খুঁজে না পেয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়ে ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে রাশি রাশি শুকনো পাতা উড়িয়ে তুলছে। যেন বনবাসী অদৃশ্য প্রেতাত্মাদের মাংসহীন অস্থিকঙ্কালের খড়মড় খড়মড় শব্দ! লক্ষ লক্ষ লতা লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের আপাদমস্তক জড়িয়ে যেসব জাল ফেলেছে, ঘন পাতার যবনিকা ভেদ করে তাদের দেখা যায় না এবং দুপুরের প্রখর সূর্যকরও সে দুর্ভেদ্য আবরণের ভিতর দিয়ে নিচেকার অনন্ত গুল্ম ও

কাঁটাঝোপের উপরে এসে পড়তে পারে না। অরণ্যের তলায় বিরাজ করে রাত্রিময় দিবসের ভয়াবহ অন্ধকার এবং তারই মধ্যে থেকে থেকে জাগে মাতঙ্গদের বৃংহিত ও পৃথিবী কাঁপানো পদশব্দ এবং ব্যাঘ্র—ভালুকের হিংস্র কণ্ঠধ্বনি এবং হতভাগ্য নানা জীবের মৃত্যু—আর্তনাদ!

এই মহাকান্তারেরই স্থানে স্থানে বন—জঙ্গল কেটে মানুষেরা বসবাস করবার চেষ্টা করেছে। বটে, কিন্তু বিরাট অরণ্যের বিপুল জঠরের ভিতর থেকে তাদের আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না। সেসব গ্রামের অবস্থা হয়েছে যেন মহাসাগরের মাঝে মিশিয়ে যাওয়া এক এক ঘটি জলের মতো।

মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ—যেমন তার নাম, তেমনই তার আকৃতি, তেমনই তার প্রকৃতি! সে হচ্ছে এক অনার্য রাজা, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ প্রায় পাঁচ হাত উঁচু দানবের মতো তার দেহ—তার এক একখানা হাত সাধারণ মানুষের উরুর মতো মোটা এবং পায়ের তালে তার মাটি কাঁপে থরথরিয়ে! তার মিষ্ট কথাও শোনায় বাঘের গর্জনের মতো এবং সে যখন অট্টহাস্য করে লোকের কানে লেগে যায় তালা!

মানুষ হলেও ব্যাঘ্ররাজের একমাত্র সম্বল হচ্ছে পশুশক্তি। দয়ামায়া—মেহের কোনও ধারই সে ধারে না। তাই মহাকান্তারের আশপাশের রাজ্যের বাসিন্দারা তার নাম শুনলেই চোখের সামনে দেখে মৃত্যুর স্বপ্ন! কারণ সে যখন অরণ্যের অন্ধকার ছেড়ে দেশে দেশে দস্যুতা করতে বেরোয়, তখন আকাশের বুক রাঙা করে দিকে দিকে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গ্রাম ও নগর, পথে পথে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে নরনারী—শিশু—বৃদ্ধ—যুবার মৃতদেহ, সর্বত্র ছড়িয়ে যায় হাজার হাজার মানুষের কাতর ক্রন্দন!

সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে আসেন না। প্রথম প্রথম দু একজন সে চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু মহাকান্তারের মৃত্যু—ভীষণ অন্ধকারজালে, তার ক্ষুধার্ত উদর থেকে আজ পর্যন্ত কোনও বিদেশিই মুক্তিলাভ করতে পারেনি!

আজ ব্যাঘ্ররাজের পরামর্শ—সভা বসেছে। পরামর্শ—সভা বললে বোধহয় ঠিক হবে না। ব্যাঘ্ররাজ জীবনে কারুর পরামর্শে কান পাতেনি। সে মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্যান্য সর্দারদের আহ্বান করে কেবল হুকুম দেবার জন্যেই।

গদা বা মুগুর। মাথার ঝুলে—পড়া লম্বা লম্বা চুলে ও গোঁফ—দাড়িতে তার মুখের অধিকাংশ ঢাকা পড়ে গিয়েছে—তারই ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে অজগরের মতো কুতকুতে তীব্র দুটো বড়ো বড়ো দাঁত!

ব্যাঘ্ররাজ অতিশয় উত্তেজিতভাবে তখন আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। হাতের গদটা সশব্দে আসনের উপরে রেখে দিয়ে সে বললে, "সুমুদুরগুপ্ত মহাকান্তারের প্রান্তে এসে হাজির হয়েছে বলে তোমরা ভয় পোচ্ছ কেন? তোমরা কি জানি না, আমার এই মহাকান্তারের চারিধারে কত রাজার অস্থিচূর্ণ ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে আছে? আসুক সুমুদুরগুপ্ত, সে আমার করবে কী?"

সেনাপতি বললে, "আমিও মহারাজের মত সমর্থন করি। আমাকে আদেশ দিন, সৈন্যরাও প্রস্তুত, আমরা এই মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রা করতে রাজি আছি।"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, সমুদ্রগুপ্ত সাধারণ শত্রু নয়, সে কত সহজে কৌশলরাজ মহেন্দ্রকে হারিয়ে দিয়েছে, তা কি আপনি শোনেননি?'

ব্যাঘ্ররাজ ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "শুনেছি হে মন্ত্রী, শুনেছি। কোশলরাজ মহেন্দ্র কি আমারও হাতের মার খায়নি? তার হাত থেকে আমিও কি মালবরাজার মেয়ে দত্তাদেবীকে ছিনিয়ে আনিনি? মহেন্দ্র আর আমি কি সমান? হেঁঃ! মন্ত্রী, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি বেজায় কম! সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, আমার গদা ওখানে শুয়ে আছে। বেশি যদি ঘ্যান ঘ্যান করো তাহলে এখনই আমার গদা তোমার

বউকে বিধবা না করে ছাড়বে না! হেঁঃ, সুমুদুরগুপ্ত না পুকুরগুপ্ত, খালগুপ্ত! একবার আমার হুংকার শুনলেই তার নাড়ি ছেড়ে যাবে! হেঁঃ!”

বুদ্ধিমান মন্ত্রী আড়চোখে একবার গদার দিকে চেয়েই নিরাপদ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়বার চেষ্টা করলে।

ব্যাঘ্ররাজ বললে, কী হে মন্ত্রী, সরে পড়ছ বড়ো যে?

—আজ্ঞে না মহারাজ, সরে পড়বা কেন? কী আদেশ বলুন।

—পুকুরগুপ্ত কত সৈন্য নিয়ে এসেছে সে খবর রাখো?

আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। সমুদ্রগুপ্ত যে অসংখ্য সৈন্য নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে, এ খবর আমি পেয়েছি। কিন্তু সে মহাকান্তারের দিকে এসেছে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে।”

—মোটে পঞ্চাশ হাজার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।

—সেনাপতি, আমাদের কত সৈন্য আছে?

—পঁচিশ হাজার।’

—পঁচিশ হাজার? হেঁঃ! ব্যাঘ্ররাজের এক একজন সৈন্য পুকুরগুপ্তের চার চারজন সৈন্যের সমান! কী বলে হে সেনাপতি, তাই নয় কি?”

—নিশ্চয়ই মহারাজ, নিশ্চয়ই!

—তুমি কী বলে হে মন্ত্রী?

মন্ত্রী আর একবার গদার দিকে তাকিয়ে বললে, নিশ্চয় মহারাজ, নিশ্চয়!

—হেঁঃ! মন্ত্রী, আমার গদার ভয়ে তুমি ও—কথা বলছি না তো?

—সে কী মহারাজ, আপনার মন্ত্রী হয়ে গদাকে আবার কীসের ভয়? ও গদার ঘা খেয়ে খেয়ে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে যে!

—ত যা বলেছ, পেটে খেলেই পিঠে সয়! হেঁঃ, মাইনেটি তো বড়ো কম পাও না! যাক ও কথা! সেনাপতি, তুমিই যুদ্ধে যাও! আমি আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না।”

সেনাপতি বিদায় নিলে।

দু, মাস সময় চেয়েছিল, আজ সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ!

—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, দত্তাদেবীর সঙ্গে আজ বাদে কাল আমার বিয়ে হবে! হেঃ, কী আনন্দ মন্ত্রী, কী আনন্দ। কাল সকালে উঠেই তুমি বিয়ের সব বন্দোবস্ত করে ফ্যালো বুঝেছ?”

—বুঝেছি।

ব্যাঘ্ররাজ গর্জন করে বললেন, বুঝেছ না। ছাই বুঝেছ, ঘোড়ার ডিম বুঝেছ! হেঁঃ, কী বুঝেছ বলো দেখি?

—আজ্ঞে না মহারাজ, আমি কিছুই বুঝিনি!

—তাই বলো। তুমি কিছু বুঝলে কি বোকার মতো আমার মন্ত্রী হতে আসতে? কিন্তু বোঝে আর না বোঝে, যা বললুম মনে রেখো। এখন চলো, রাজধানীর সিংহদ্বারের ওপরে নহবতখানায় বসে মজা করে যুদ্ধ দেখা যাক।

আশ্চর্য ব্যাপার, এটা কল্পনাই করা যায় না। ব্যাঘ্ররাজ যা বলেছিল তাই হল। রাজধানীর সামনেই এক মস্ত মাঠ—তার দুই দিকেই গভীর অরণ্য। মাঠের মধ্যে খানিকক্ষণ যুদ্ধ হবার পরেই মগধ সৈন্যেরা বেগে পলায়ন করতে লাগল এবং তাদের পিছনে পিছনে ছুটল জয়ধ্বনি করতে করতে মহাকান্তারের সৈন্যগণ!

সিংহদ্বারের উপর থেকে বিকট আনন্দে চেঁচিয়ে ব্যাঘ্ররাজ বললে, দেখেছ হে মন্ত্রী, দেখছ? মহাকান্তারের বীরত্বটা দেখছ তো? তবু আমি যুদ্ধে নামিনি।

মন্ত্রী প্রকাশ্যে কিছু না বলে মাথা নাড়তে নাড়তে মনে মনেই বললে, দিগ্বিজয়ী মগধ সৈন্যরা এত সহজে পালাবে? অসম্ভব! ভেতরে নিশ্চয়ই কোনও ফন্দি আছে। কিন্তু ফন্দিটা যে কী হতে পারে সেটা বোঝা গেল না।

ব্যাঘ্ররাজ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, মন্ত্রী, মগধের দর্প তো চূর্ণ হল, আমি বাঘগড়ে দত্তাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চললুম।

ব্যাঘ্ররাজ চলে গেল, মন্ত্রী কিন্তু সেখান থেকে নড়ল না। দূর মাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মগধসৈন্যদের তাড়া করে মহাকান্তারের সৈন্যেরা তখন অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল মাঠের দুই পাশের বনের দিকে। চমকে উঠে সে বললে, অ্যা! আগে ছিল অর্ধচন্দ্র ব্যূহ, এখন হচ্ছে চক্রব্যূহ! কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ!

একাদশ পরিচ্ছেদ

হরিণ ছোটে অন্ধবনে,
নেই নিশানা—নেই ঠিকানা!
হায় সে ভীরু পায়নি খবর
ব্যাঘ্র কোথায় দিচ্ছে হানা!

মগধ সৈন্যের সঙ্গে মহাকান্তারের সৈন্যদের যুদ্ধ হচ্ছিল নগরের সিংহদ্বারের—অর্থাৎ সামনের দিকে।

সেখান থেকে বাঘগড়ে যেতে হলে নগরের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে ক্রোশ তিনেক পথ পেরুতে হয়। এ পথ বাইরের কেউ চেনে না। কাজেই নগরে কোনও বিপদের সম্ভাবনা দেখলে ব্যাঘ্ররাজ এইখানে এসেই আশ্রয় গ্রহণ করত। এবং নিরাপদ বলেই সে দত্তাদেবীকে লুকিয়ে রেখেছিল বাঘগড়ে।

রাজধানী থেকে বাঘগড়ের পথ ক্রোশ তিনেকের বেশি নয় বটে, কিন্তু কোনও অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে ও—পথে হাঁটবার চেষ্টা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহাকান্তারের বিভীষণ মূর্তি এইখানেই ফুটে উঠেছে ভালো করে। কেবল অরণ্যই যে এখানে বেশি নিবিড় ও দুর্ভেদ্য, তা নয়। একটানা পাহাড়, চড়াই—উতরাই, গিরিসংকট, জলপ্রপাত, নদী ও খাদ প্রভৃতি একত্রে মিলে এ স্থানটাকে মানুষের অগম্য করে তোলবার চেষ্টা করেছে। বনবাসী হাতিরা পর্যন্ত এদিকটা মাড়াতে চায় না। যদিও বনের অন্ধকার এখানে যখন তখন কেঁপে ওঠে বাঘের ধমকে ও ভালুকের ঘুৎকারে এবং ভয়াবহ অজগররা নীরবে শিকার খুঁজে বেড়ায় এর যেখানে সেখানে! যে মানুষ এখানকার গুপ্তপথ চেনে সেও যদি একবার অন্যমনস্ক হয় তাহলে সেই মুহূর্তেই তার মৃত্যুসম্ভাবনা।

শহর থেকে বাঘগড়ে যাবার এই অতি দুর্গম পথটি রীতিমত সুরক্ষিত। ব্যাঘ্ররাজ পথের উপরে পাহারা দেবার জন্যে প্রায় চারিশত রক্ষী সৈন্য নিযুক্ত করেছেন। তাদের কারুকেই চোখে দেখা যায় না। অন্ধ গিরিগুহার ভিতরে, বড়ো বড়ো পাথরের আড়ালে, প্রকাণ্ড বনস্পতির পত্রবাহুল ডালে ডালে নিঃশব্দ ছায়ার মতো তারা আত্মগোপন করে থাকে, হাতে তাদের ধারালো বর্শা, ধনুক,বাণ! শত্রু কিছু জানিবার বোঝবার আগেই ইহলোকের গণ্ডী ছড়িয়ে হাজির হবে একেবারে পরলোকের সীমানায়!

বাঘগড়ের পিছনেও আর একটা দুর্গম গুপ্তপথ আছে। কিন্তু সেদিক দিয়ে বাইরের শত্রু আসবার সম্ভাবনা নেই, কারণ বাইরের কেউ তার অস্তিত্ব জানে না। ভবিষ্যতে যদি কখনও চূড়ান্ত বিপদে দরকার হয়, ব্যাঘ্ররাজ সেইজন্যে নিজের ব্যবহারের জন্যে এই পালাবার পথটি তৈরি করে রেখেছে। এদিকে পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে কোনও লোকালয় নেই বলে পথে পাহারা দেবার জন্যে রক্ষী রাখবারও দরকার হয়নি।

হয়ত সবদিকে আঁটঘটি বাঁধা বলেই দুর্গ হিসাবে বাঘগড়কে দুর্ভেদ্য করবার চেষ্টা হয়নি। ধরতে গেলে তাকে গড় না বলে প্রাসাদ বলাই উচিত। সেকালে কেবল জবাড়ি নয়, অধিকাংশ সাধারণ ধনীর চারিদিকে গড়খাই কাটা উঁচু পাঁচিল ঘেরা অট্টালিকাকেও দুর্গ বলে মনে হোত। প্রাচীনকালে, এমন কি মধ্যযুগেও আইনের বাঁধন এমন কঠিন ছিল না, দেশে সর্বদাই ছিল অশান্তির সম্ভাবনা। কেবল বিদেশি শত্রু নয়—বড়ো বড়ো ডাকাতদের সশস্ত্র দলও যখন তখন গৃহস্থদের করত আক্রমণ। এই সব কারণে যার কিছুমাত্র সঙ্গতি ছিল, সেই—ই নিজের বাড়িকে যতটা সম্ভব দুর্গের আদর্শে গড়ে তোলবার চেষ্টা করত।

এই বাঘগড়ে বন্দিনি হয়েছেন মালব রাজকুমারী দত্তাদেবী।

প্রাসাদের তিনতলার ছাদে সুদূর অরণ্য ও পর্বতমালার দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দত্তাদেবী দাঁড়িয়েছিলেন। পাশেই তাঁর পরিচারিকা বা সহচরী লক্ষ্মী। ইনিও মালব দেশের মেয়ে, দত্তাদেবীর সঙ্গে বন্দিত্ব স্বীকার করেছেন।

দত্তা বললেন, আজ আমার শেষ স্বাধীনতার দিন, লক্ষ্মী!

—দেবী, আজও কি আপনি নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করছেন? আপনি যে বন্দিনি, এ কথা কি ভুলে গিয়েছেন?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দত্ত বললেন, কিছুই ভুলিনি লক্ষ্মী! ব্যাঘ্ররাজ বন্দি করেছে। কেবল আমার দেহকে, এখনও মন আমার নিজেরই আছে। কিন্তু সে আমাকে আজ পর্যন্ত সময় দিয়েছে, আজ যদি এখান থেকে উদ্ধার না পাই, তবে কাল সে আমাকে বিবাহ করবে—তখন আমার দেহ আর মন দুই—ই হবে বন্দি!

ভাঙা ভাঙা গলায় লক্ষ্মী বললেন, দেবী, সেই অসীম দূর্ভাগ্যের জন্যই প্রস্তুত হন। যার আশায় আপনি পথ চেয়ে আছেন, সেই সমুদ্রগুপ্ত তো আজও এলেন না!

—ব্যাঘ্ররাজের এক সর্দারকে আমার গায়ের সমস্ত অলঙ্কারের লোভ দেখিয়ে বশীভুত করেছি। সে যে মহারাজা সমুদ্রগুপ্তকে আহ্বান করতে গিয়েছে সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, হয় সে পথে কোনও বিপদে পড়েছে, নয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে পারেনি।

—দেবী, এটাও তো হতে পারে যে মহারাজা সমুদ্রগুপ্ত আপনার দূতের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেননি?

—অসম্ভব লক্ষ্মী, অসম্ভব! মনের চোখে আমি দ্বাপরের ভীষ্ম, কর্ণ, অর্জ্জুনের যেসব বীরমূর্তি দেখতে পাই, সমুদ্রগুপ্তের কথা ভাবলে তাঁদের কথাই স্মরণ হয়! যে মহাবীর আর্যবর্তের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে দৃঢ় পণ করেছেন, অনার্য নররক্ষসের কবলে বন্দিনি আর্যকন্যার কাতর ক্রন্দনে তিনি কর্ণপাত করবেন না, এ অসম্ভব কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না!

লক্ষ্মী কথা শুনতে শুনতে কান পেতে যেন আরও কিছু শুনছিলেন। তিনি বললেন, খুব দূর থেকে অস্পষ্ট সমুদ্রগর্জনের মতো একটা কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন কি?

সেটা হচ্ছে রাজধানীর অনতিদূরে যে যুদ্ধ চলছে তারই গোলমাল। দুই পক্ষের প্রায় পঁচাশি হাজার সৈনিকের সিংহনাদ বা আর্তনাদ ও অস্ত্রঝাঞ্চনা, মহাকান্তারের তিন—চার ক্রোশব্যাপী নদী—জঙ্গল—পাহাড়ের উপর দিয়ে বাতাস বহন করে আনছে তারই কিছু কিছু নমুনা!

দত্তাও শুনলেন। হতাশভাবে বললেন, কাল আমার বলিদান। রাজধানীর রাক্ষসরা তাই হয়ত আজ থেকেই উৎসব আরম্ভ করেছে!

সেই নিরাশা—মাখা কণ্ঠস্বর শুনে লক্ষ্মীর চোখে এল জল। পাছে দত্তা দেখতে পান। তাই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু পরমুহূর্তেই আর একটা শব্দ শুনে লক্ষ্মী দ্রুতপদে ছাদের ধারে ছুটে গেলেন। সেখান থেকে একবার সামনের দিকে চেয়েই তিনি আর্তস্বরে বলে উঠলেন, দেবী, দেবী!

—কী লক্ষ্মী?

—দূরে বনের পথে চারজন অশ্বারোহী!

দত্তাও ছুটে গিয়ে দেখলেন।

—দেবী, ওদের একজনের চেহারা দেখুন! প্রকাণ্ড মানুষের মতো মূর্তি, বাঘছালের পোশাক! ব্যাঘ্ররাজ আসছে!

অগ্নিশিখা! তীব্র স্বরে আবার তিনি বললেন, লক্ষ্মী, প্রাণ বড়ো, না মান বড়ো?

—মান বড়ো দেবী, মান বড়ো!

—তাহলে তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবো?

—কোথায়?

—বাঘগড়ের পিছনকার বনে? ওখানে কেউ পাহারা দেয় না।

—দেয় দেবী। ওখানে পাহারা দেয় হিংস্র জন্তুরা—বাঘ, ভালুক, বরাহ, অজগর।

—কিন্তু ব্যাঘ্ররাজের চেয়ে তারা ভয়ানক নয়! তারা মানুষের মান কেড়ে নেয় না। আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।...লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, আর দেরি নয়! ওই শোনো, ঘোড়ার পায়ের শব্দ কত কাছে এসে পড়ল! আর দেরি করলে পালাবারও সময় পাব না। আমি পিছনের দরজা দিয়ে এখনই বেরিয়ে যাব—তোমার যদি ভয় হয় তবে তুমি এখানেই থাকে। বিদায় লক্ষ্মী!

—আপনার সঙ্গে যখন এখানে এসেছি, তখন অন্য কোথাও যেতে আমার ভয় হবে না!

দুজনে প্রাণপণে ছুটে ছাদ থেকে নেমে গেলেন। ওদিকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ বাঘগড়ের ভিতরে এসে থামল। একলাফে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে ব্যাঘ্ররাজ প্রাসাদের উপরে উঠে এলো এবং একেবারে প্রবেশ করলে দত্তাদেবীর ঘরে।

ঘরে কেউ নেই। ব্যাঘ্ররাজ চিৎকার করে ডাকলে, দত্তাদেবী, দত্তাদেবী কোথায়? আমি এসেছি, শুনতে পোচ্ছ না?

তবু কারুর সাড়া নেই।

—প্রহরী, প্রহরী! শিগগির দত্তাদেবীকে ডেকে আনো!

প্রহরীরা চারিদিকে ছুটিল। ব্যাঘ্ররাজ দুম দুম শব্দে মেঝে কাঁপিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রহরীরা খানিক পরে এসে ভয়ে ভয়ে জানালে, প্রাসাদের কোথাও দত্তাদেবীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ব্যাঘ্ররাজ কটমট করে দুই চো খ পাকিয়ে এবং দুই পাটি দাঁত বার করে খিঁচিয়ে বলে উঠল, কী! খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? আমার সামনে এত বড়ো অলুক্ষণে কথা বলবার সাহস হল তোদের? জনিস, এখুনি সবাইকে শূলে চড়িয়ে দেব?

এমন সময়ে হন্তদন্তের মতো মন্ত্রীমহাশয়ের প্রবেশ। ব্যাঘ্ররাজ তেড়ে উঠে বললে, হেঃ! তুমি আবার আমার পিছুপিছু এখানে মরতে এলে কেন? কে তোমাকে ডেকেছে?

—মহারাজ, মহারাজ!

—চুপ করো মন্ত্রী, বাজে কথা এখন ভালো লাগছে না। জানো, দত্তাদেবীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—মহারাজ, ওদিকে যে সর্বনাশ উপস্থিত!

—মন্ত্রী, গদার বাড়ি দু এক ঘা না খেলে তোমার মুখ বন্ধ হবে না বুঝি!

—মহারাজ, এতক্ষণে বোধ হয়। মগধ সৈন্যরা রাজধানী দখল করেছে। ব্যাঘ্ররাজ এবারে গর্জন না করে অট্টহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে বললে, আমার সঙ্গে এসেছ ঠাট্টা করতে? স্বচক্ষে দেখে এলুম—

—স্বচক্ষে যা দেখেছেন ভুল দেখেছেন। মগধ সৈন্যরা পালাচ্ছিল বটে, কিন্তু সেটা হচ্ছে তাদের কৌশল!

ব্যাঘ্ররাজের রাগ এইবারে জল হয়ে এল। হতভাম্বের মতো বললে, কৌশল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! যুদ্ধক্ষেত্রের দুই পাশে ছিল গভীর বন। মগধের হাজার কুড়ি সৈন্য মাঝখানে ছিল অর্ধচন্দ্রের আকারে। আমরা আক্রমণ করতেই আপনি তাদের পালিয়ে যেতে দেখেছেন তো?

—কিন্তু তারা পালায়নি।

—মহাকান্তারের সৈন্যদের ভুলিয়ে নিজেদের অর্ধচন্দ্র ব্যূহের আরও ভিতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

—তারপর মন্ত্রী, তারপর?

—তারপর হঠাৎ দেখি, যুদ্ধক্ষেত্রের দুইধারের বন থেকে পিল পিল করে মগধ সৈন্য আক্রমণ করলে। আমরা সে আক্রমণও হয়ত সহ্য করতে পারতুম,

কিন্তু দেখতে দেখতে দুইধারের বন থেকে আরও প্রায় হাজার ত্রিশ মগধ সৈন্য বেরিয়ে মহাকান্তারের সৈন্যদের ডান, বাম ও পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেললে। সেই পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের যে অবস্থা হল তা আর বলবার নয়। মগধের জয়নাদে আর মহাকান্তারের আর্তনাদে আকাশ—বাতাস ভরে গেল!! আমি আর সইতে না পেরে আপনাকে খবর দেবার জন্যে প্রাণপণে ছুটে আসছি। এতক্ষণে আমাদের সব সৈন্য যে হত বা বন্দি হয়েছে সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই— হয়ত মগধ সৈন্যরা আমাদের রাজধানীও অধিকার করেছে!

রবারের বলের ভিতর থেকে হাওয়া বেরিয়ে গেলে সেটা যেমন চুপসে যায়, মন্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে ব্যাঘ্ররাজের মুখের অবস্থাও হল কতকটা সেইরকম। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, মন্ত্রী, তোমার বাক্যি শুনে আমার পিলে ভয়ানক চমকে যাচ্ছে যে। মহাকান্তারের রাজধানীতে মগধের সৈন্য! আজি আমি কার মুখ দেখে উঠেছি?

আচম্বিতে বাঘগড়ের প্রাকার থেকে ভোঁ ভোঁ রবে বেজে উঠল। প্রহরীর ভেরি!

ব্যাঘ্ররাজ চমকে লাফ মেরে বললে, মন্ত্রী, ও আবার কী বাবা?

একজন লোক দৌড়ে এসে সভয়ে খবর দিলে, মহারাজ! বাঘগড়ের পিছনকার বনের ভিতর দিয়ে দলে দলে শত্রু আসছে!

—মন্ত্রী, মন্ত্রী, একী শুনি? বাঘগড়ের পিছনকার বনের গুপ্তপথের সন্ধান শত্রুরা জানলে কেমন করে?

—মহারাজ, আমাদের রাজ্যে নিশ্চয় কোনও বিশ্বাসঘাতক আছে!

আবার আর একটা লোক এসে খবর দিলে, মহারাজ, হাজার হাজার শত্রু রাজধানীর দিক থেকে বাঘগড়ের পথ দিয়ে ছুটে আসছে!

ব্যাঘ্ররাজ ধপাস করে একখানা আসনের উপরে বসে পড়ে বললে, কী হবে মন্ত্রী, এখন কী হবে? সামনে শত্রু, পিছনে শত্রু! বাঘগড় তো নামে মাত্র কেল্লা! শত্রুদের ঠেকাই কেমন করে? ও বাবা, এ আমার কী হল গো!

মন্ত্রী বললে, মহারাজ, শত্রুদের দৃষ্টি দেখছি বাঘগড়ের দিকেই! ওরা নিশ্চয় দত্তাদেবীর খোঁজেই এদিকে আসছে!

ব্যাঘ্ররাজ মাথায় করাঘাত করে বললে, হায় রে আমার পোড়াকপাল! কেন ও কালসাপিনীকে ধরতে গিয়েছিলুম!

—মহারাজ, আর আক্ষেপ করারও সময় নেই! যদি বাঁচতে চান তো তাড়াতাড়ি বাঘগড়ের পিছনকার গুপ্তদ্বার খুলে বনের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে থাকবেন চলুন!

মন্ত্রী ছুট মারলে—পিছনে ব্যাঘ্ররাজও!

গুপ্তদ্বার খুলে বাইরে যেতে তাদের কিছুমাত্র দেরি হল না। দত্তাদেবী আর লক্ষ্মীও এই পথেই পলায়ন করেছেন। একই পথ ধরে ছুটল বাঘ ও হরিণ!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আঁধারা—পথেও এগিয়ে গেল
পথ হারাল যারা,
সামনে হঠাৎ জাগল কখন
উজল ধ্রুবতারা।

কোথায় আকাশ, কোথায় বাতাস! সে যেন অন্ধকারের অনন্ত সাম্রাজ্য! উপরে, নিচে, এপাশে, ওপাশে অন্ধকারের পরে যেন অন্ধকারের তরঙ্গ! সে যেন বিরাট এক ক্ষুধার্ত বিভীষিকা, পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে!

লক্ষ্মী প্রায় কঁদো কঁদো গলায় বললেন, দেবী, চোখ আর পা কিছুই যে চলছে না! নিচে পথ নেই, মাথার উপরে ঘন পাতার ভেতরে একটা ফুটো, আলোর একটা রেখা পর্যন্ত নেই!

দত্তা বললেন, তবু আমাদের এগুতে হবে! চলো লক্ষ্মী, দুহাতে বনজঙ্গল ঠেলে আরও ভেতরে গিয়ে লুকোই চলো! এ অন্ধকারকে এখন আমার বন্ধু বলে মনে হচ্ছে! এখানে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না!

—না দেবী, না! আমার মনে হচ্ছে, এখানে শত শত অজানা শত্রু অদৃশ্য চক্ষু মেলে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে! তাদের হাত ছাড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নেই।—কোনও উপায় নেই!

লক্ষ্মীর গলার আওয়াজ শুনে বোধ হয়, এইবারে তিনি কেঁদে ফেলবেন!

দত্তা লক্ষ্মীর পিঠের উপর একখানি হাত রেখে ধীরে ধীরে বললেন, ভয় পেয়ো না লক্ষ্মী, তাহলে আমাদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। এই ভয়ানক গহন বনে আমাদের কপালে যদি মৃত্যু লেখা থাকে, তাহলেও এই সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারব যে ব্যাঘ্ররাজকে ফাঁকি দিয়েছি!

ফোঁস করে একটা বিশ্রী গর্জন জেগে উঠল—লক্ষ্মীর পায়ের উপর দিয়ে তীব্র গতিতে চলে গেল যেন একটা শীতল ও ভয়াবহ শব্দ—বিদ্যুৎ! এবারে লক্ষ্মী ভয়ার্ত চিৎকার না করে থাকতে পারলেন না।

—চুপ চুপ! হল কী লক্ষ্মী?

—পায়ের উপর দিয়ে একটা সাপ চলে গেল! দেবী, আর আমি এগুতে পারব না, কপালে যা আছে তাই হবে!

—তাহলে তুমি এইখানে থাক, আমি একলাই অগ্রসর হব।

—কোথায় অগ্রসর হবেন? সামনের দিকে চেয়ে দেখুন! মাগো!

দশ বারো হাত তফাতে অন্ধকার হয়ে উঠেছে যেন অগ্নিময়! চারটে বড়ো বড়ো বুভুক্ষু চক্ষু দপদপ করে জ্বলছে! ও কাদের চোখ? বাঘ, না বাঘিনি? ভালুক? বরাহ? কিছুই বোঝা যায় না।

দুই হাতে মুখ ঢেকে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন লক্ষ্মী।

দীপ্ত চোখগুলো নিভে গেল। অন্ধকারের মধ্যে শুকনো পাতা মাড়ানোর শব্দ হল! জন্তু দুটো চলে যাচ্ছে।

দত্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ভয় নেই লক্ষ্মী! মৃত্যু আপাতত আমাদের গ্রহণ করলে না।

পরমুহূর্তেই অন্ধকার যৌন আচম্বিতে ভাষা পেয়ে বললে, কে? কে এখানে কথা কইছে?

দত্ত অন্ধের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটলেন—পিছনে পিছনে লক্ষ্মীও। কখনও বড়ো বড়ো গাছের গুড়িতে ধাক্কা খেয়ে, কখনও কাঁটাঝোপে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, কখনও মাটির উপরে পড়েই আবার উঠে তাঁরা ছুটতে লাগলেন এবং প্রতিমুহূর্তেই তাদের মনে হতে লাগল। এই মুহূর্তেই জীবনের শেষ মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন তাঁদের পিছনেও উঠেছে একাধিক পায়ের দ্রুত পদশব্দ!

যারা পালাচ্ছে আর যারা অনুসরণ করছে। তারা কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছে না।——কেবল পদশব্দের পিছু নিয়েছে শব্দ!

ছুটতে ছুটতে দত্ত লক্ষ করলেন, অরণ্য আর তত দুর্ভেদ্য নয়, অন্ধকার আর তত গাঢ় নয়, মাথার উপরে মাঝে মাঝে আলোর আভাস, মাঝে মাঝে ফুটে উঠছে সমুজ্জ্বল আকাশের এক একটা টুকরো। দারুণ ভয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অন্ধকারের যে নিবিড়তা এতক্ষণ তাদের রক্ষা করছিল, এইবারে তার সাহায্য বুঝি হারাতে হয়!

পিছন থেকে বিকট চিৎকার জাগল, পেয়েছি মন্ত্রী, আমার বউকে পেয়েছি!

ব্যাঘ্ররাজ ও মন্ত্রী তখন দত্তাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। অন্ধকারের রাজ্য শেষ হল——একখণ্ড খোলা জমির উপরে বিরাজ করছে দিনের আলো!

আর পালাবার চেষ্টা করা মিছে বুঝে দত্তা ও লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে পড়লেন। ব্যাঘ্ররাজও দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, বাব্বা! তুমি বউ, না উড়োপাখি? একেবারে বেদম হয়ে গিয়েছি যে!

মন্ত্রী বললে, মহারাজ, এখানে অপেক্ষা করা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? বনের গুপ্তপথ দিয়ে শত্রু আসছে সে কথা কি ভুলে গেলেন?

—হেঁঃ! সে কথাও ভুলিনি, আমার বউকেও ভুলব না! হারাধন যখন ফিরে পেয়েছি তখন তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

—মহারাজ, শাস্তরে বলে, পথে নারী বিবর্জিতা।

—মরছি হাঁপিয়ে, এখন আবার শাস্তর—ফাস্তর নিয়ে গোলমাল কোরো না বাপু

—আমার কথা শুনুন মহারাজ! ঐ দত্তাদেবীর জন্যেই আজ আপনার এত বিপদ! আমি বলি কি, ও—আপদকে আপনি বনবাস দিয়ে যান!

—'মন্ত্রী, গদাটা আমি ভুলে ফেলে এসেছি বলেই তুমি এত মুখ নাড়ছ বুঝি? কিন্তু জানো তো, আমার হাত গদার চেয়ে কম শক্ত নয়!' ব্যাঘ্ররাজ ভারী ভারী পা ফেলে দত্তার দিকে এগিয়ে গেল।

দত্ত পায়ে পায়ে পিছোতে পিছোতে বললেন, রাজা, আমার কাছে আসবেন না।

—কাছে আসব না মানে? হেঁঃ, তুমি না। আমার বউ হবে?

—আপনার স্ত্রী হবার আগে আমি আত্মহত্যা করব।

—এ আবার কী রকম উলটো কথা হল? এমন কথা তো ছিল না!

—মালবের রাজকুমারীর সঙ্গে কোনও পশুর বিয়ে হতে পারে না!

ব্যাঘ্ররাজের কুতকুতে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ও তাঁর বাঁদুরে থ্যাবড়া নাকটা ফুলে উঠল, এমন আশ্চর্য কথা আজ পর্যন্ত তার মুখের সামনে আর কেউ বলতে সাহস করেনি। সে বললে, আমি পশু? ওহে মন্ত্রী, মেয়েটা কী হে?

মন্ত্রী মনে মনে বললে, মেয়েটা অত্যুক্তি করেনি। মুখে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, মহারাজ, দত্তাদেবী আপনাকে বোধ হয় পশুরাজ বলতে চান। আপনি পুরুষসিংহ কিনা?

অমনই বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, দুইদিকে দুই বাহু ছড়িয়ে ব্যাঘ্ররাজ সগর্বে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! বউ, একবার আমার দিকে ভালো করে চেয়ে দ্যাখো দেখি, সত্যিই আমি পুরুষসিংহ। কিনা!! এমন চেহারা কটা দেখেছ?"

মন্ত্রী মনে মনে বললে, মানুষের সৌভাগ্য যে পৃথিবীতে এমন চেহারা বেশি দেখা যায় না।

দত্ত কিছু বললেন না, তাঁর দুই চোখে বিজাতীয় ঘৃণা।

ব্যাঘ্ররাজ হঠাৎ লাফ মেরে দত্তাকে ধরতে গেল।

দত্তা তাড়াতাড়ি পিছনে সরে গেলেন।

লক্ষ্মী আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে আছো রক্ষা করো, রক্ষা করো! ব্যাঘ্ররাজ অট্টহাস্য করে বললে, ভয় নেই, আমিই তোমাদের রক্ষা করব!'

—রক্ষা করো, রক্ষা করে!

—ওহে মন্ত্রী, একেই বুঝি অরণ্যে রোদন বলে? ও বোকা মেয়েটা চেঁচিয়ে কাকে ডাকতে চায়?

পিছন থেকে গম্ভীর স্বরে কে বললে, আমাকে।

ব্যাঘ্ররাজ চমকে ফিরে সবিস্ময়ে দেখলে এক দীর্ঘদেহ সৈনিক স্থির পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন! মাথায় শিরস্ত্রণ, দেহে বর্ম, পৃষ্ঠে তূণ ও ধনু, কটিবন্ধে তরবারি, ডান হাতে বর্শাদণ্ড । মুখ দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে তিনি কোনও অসাধারণ পুরুষ। ব্যাঘ্ররাজ আগন্তুকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। তুমি কে বটে হে?

—আমি সমুদ্রগুপ্ত।

ব্যাঘ্ররাজের চোখ দুটি যেন ঠিকরে পড়বার মতো হল। বিস্ময়ের আতিশয্যে সে কথা বলতে পারলে না ।

সমুদ্রগুপ্ত প্রশান্ত নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, দেবী, শ্রেষ্ঠ ফুল দেখলেই চেনা যায়, পরিচয়ের দরকার হয় না। মালব—রাজকুমারী, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ব্যাঘ্ররাজ চিৎকার করে বললে, ওহে সুমুদুরগুপ্ত, তুমি জানো আমি কে?

সমুদ্রগুপ্ত একটু হেসে বললেন, নিকৃষ্ট পশুকে দেখলেই চেনা যায়। তুমি ব্যাঘ্ররাজ। এতক্ষণে আমার সৈন্যরা তোমার রাজধানী দখল করছে। পাছে মালব—রাজকুমারীকে নিয়ে তুমি এইদিকে দিয়ে পালিয়ে যাও, সেই ভয়েই গুপ্তপথ দিয়ে আমি বাঘগড়ে যাচ্ছিলুম।

— একা?

—একটু আড়ালেই আমার একহাজার সৈন্য অপেক্ষা করছে। তুমি কি তাদের দেখতে চাও? একবার ভেরি বাজালেই তারা আসবে।

মন্ত্রী চুপিচুপি বললে, এখন বুঝুন মহারাজ, এদিকে এসে আপনি কী অন্যায় করেছেন!

দাঁতে দাঁত ঘসে ব্যাঘ্ররাজ বললে, কী বলব সুমুদ্দুরগুপ্ত, নিতান্ত একলা পড়ে গেছি, নইলে তোমাকে একবার দেখে নিতুম।

সমুদ্রগুপ্ত সে কথার জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে দত্তার হাত ধরে তুলে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

ব্যাঘ্ররাজ গর্জন করে বললে, কী! আমার বউ—এর গায়ে হাত! মন্ত্রী, মন্ত্রী, থাবড়া মেরে সুমুদুরের গালটা ভেঙে দিয়ে এসো তো!

মন্ত্রী বললে, মহারাজ, ও কাজটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো করে করতে পারবেন। আমি এখন পালালুম।

ব্যাঘ্ররাজ ব্যস্ত হয়ে বললে, দাঁড়াও হে মন্ত্রী, দাঁড়াও! আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি!

সমুদ্রগুপ্ত ভেরি বার করে ফুঁ দিলেন!

ব্যাঘ্ররাজ সভয়ে বললে, ও মন্ত্রী, ও যে আবার শিঙে বাজায় গো!

মন্ত্রী হতাশভাবে বললে, এইবারে আমাদেরও শিঙে ফুঁকতে হবে! ওই দেখুন, চারিধার থেকে দলে দলে সেপাই আসছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিকেয় তুলে গল্পকথাগুলি
ঘাঁটব এবার ইতিহাসের ঝুলি!

ব্যাঘ্ররাজকে পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় ব্রত সমাপ্ত করবার জন্যে আবার অন্য দিকে যাত্রা করলেন।

এই ফাঁকে আমরা দু একটা কথা বলে নিই। বাজে নয়, কাজের কথা।

একশো বছর আগে সমুদ্রগুপ্তের নামও কেউ জানত না বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু তারপরে পণ্ডিতদের প্রাণপণ চেষ্টায় বহু শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা ও অন্যান্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে তিনি হচ্ছেন প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন এবং মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারত (তিন হাজার মাইল) জয় করে তিনি প্রমাণিত করেছেন, তাঁর কীর্তিকাহিনি অনাআসেই আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে!

এক হিসাবে আলেকজান্ডারের চেয়ে সমুদ্রগুপ্তকে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী বলা চলে। প্রথমত, সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, কাব্য ও সঙ্গীতেও তিনি প্রথম শ্রেণির শিল্পী বলে বিখ্যাত। দ্বিতীয়ত, আলেকজান্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাম্রাজ্যের পতন হয়। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত এমন দৃঢ় ভিত্তির উপরে সাম্রাজ্য স্থাপন করে গিয়েছিলেন যে তার পরমায়ু হয়েছিল প্রায় দুই শত বৎসর।

সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা প্রচারিত তিনটি স্বর্ণমুদ্রার প্রতিলিপি আমরা দেখেছি। এই সচিত্র মুদ্রা তিনটি চমৎকার। এর লেখাগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে। মুদ্রগুলির ছবি থেকে চতুর্থ শতাব্দীর ভারতীয় সাজপোশাক ও আসবাবের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় এবং সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর পিতা—মাতার

আকৃতি—প্রকৃতি সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর আন্দাজ করা যেতে পারে। মুদ্রা তিনটির বর্ণনা দিলুম।

প্রথম মুদ্রা: শিল্পী সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসে বীণা বাজাচ্ছেন। সিংহাসন বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, এ সে রকম সিংহাসন নয়। একখানা সামনের দিকে লম্বাটে, কিছু বেশি উঁচু, বাহারি পায়াওয়ালা জলচৌকির উপরে চেয়ারের মতো পিঠ রাখবার জায়গা থাকলে দেখতে যে রকম হয়। এই সিংহাসন হচ্ছে সেই রকম। এ সিংহাসনকে ভারতীয় কৌচ বলাও চলে। অবশ্য, সিংহাসনটি কী দিয়ে তৈরি সেটা বলা কঠিন। সোনা—রুপো বা অন্য কোনও ধাতুরও হতে পারে, কাঠের বা হাতির দাঁতেরও হতে পারে। ডান পায়ের উপর দিয়ে বাঁ পা ঝুলিয়ে সমুদ্রগুপ্ত উপবিষ্ট, বা পায়ের তলায় পাদপীঠ। তাঁর পেশিবদ্ধ, চওড়া বুক। প্রভামণ্ডলের মাঝখানে খালি মাথা, কানে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়া কুণ্ডল, গলায় হার। পরনে হাঁটুর উপরে খাটো কাপড়—সেকালের রাজারাজড়ারা যে রাজসভার বাইরে বেশি কাপড়—চোপড় পরতেন না, এটা হচ্ছে তারই প্রমাণ। তার হাতের বীণাটি অলাবুহীন, ধনুকাকৃতি—অনেকটা প্রাচীন ইউরোপীয় বীণার মতো। নাকটি বেশ দেখা যায়। গঠন ছিপছিপে, কিন্তু বলিষ্ঠ মুদ্রার চারিধারে মণ্ডলাকারে লেখা—"মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তঃ"।

দ্বিতীয় মুদ্রা: যোদ্ধা, দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় শিরস্ত্রাণ, কানে কুণ্ডল, উর্ধ্বোত্থিত বাম হাতে ধনুক, ডান হাতে তরবারি কিংবা দণ্ড, পরনে পাজামা, পায়ে পাদুকা। অশ্বারোহীর বেশ। সমুদ্রগুপ্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তাই তার সামনে গরুড়ধ্বজার উপরে গরুড়ের মূর্তি। সমুদ্রগুপ্তের এ মূর্তির মুখেও বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার সুদীর্ঘ নাসিকাটি।

তৃতীয় মুদ্রা: সমুদ্রগুপ্ত এর উপরে দেখিয়েছেন তাঁর পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও মাতা কুমারদেবীকে। এটি নাকি তাঁদের বিবাহের স্মারক মুদ্রা। মা কুমারদেবী মহাসম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন লিচ্ছবি রাজবংশের মেয়ে বলে সমুদ্রগুপ্ত যথেষ্ট গর্ব অনুভব

করতেন। চন্দ্রগুপ্তের যোদ্ধার বেশ কুমারদেবীর দেহের উপর—অংশ অনাবৃত। পণ্ডিতেরা বলেন, সেকালের রাজপরিবারেরও মেয়েরা খালি বা আব্দুল গায়ে থাকতেন (কিন্তু গুপ্ত—রাজত্বেই মহাকবি কালিদাসের উদয় হয়েছিল, তার কাব্যে কী এর নজির আছে?)। চন্দ্রগুপ্ত ডান হাতে করে রানি কুমারদেবীর হাতে কী একটি গহনা পরিয়ে দিচ্ছেন, তার বা হাতে অর্ধচন্দ্র—পতাকা । তার বা পাশে উপর থেকে নিচে লেখা 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং নারীমূর্তির ডান পাশে লেখা 'শ্রীকুমারদেবী।'

সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির চেহারা ও পোশাকের কথা বলা হল। কিন্তু কী রকম ফৌজ নিয়ে তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, এবারে সেটা দেখা দরকার। তবে এ বিভাগে আমাদের অল্পবিস্তর অনুমানের সাহায্য নিতে হবে। কারণ, সমুদ্রগুপ্ত নিজের দিগ্বিজয় কাহিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন বটে, কিন্তু নিজের বাহিনীর বর্ণনা দেননি।

তবে আমাদের অনুমান বিশেষ ভ্রান্ত হবে না। কারণ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের যুদ্ধশাস্ত্র সেনাগঠনের যেসব নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তার আর কোনও অদলবদল হয়নি বললেও চলে। রামায়ণে—বিশেষ করে মহাভারতে ফৌজ ও যুদ্ধরীতির যেসব বর্ণনা পড়ি, কবিকল্পনার অত্যুক্তি ত্যাগ করলে দেখি আলেকজান্ডারের ভারতীয় অভিযানের সময়েও সেসব বর্ণনার অনেকটাই হুবহু মিলে যায়। সমুদ্রগুপ্তেরও ঢের পরে, সপ্তম শতাব্দীর সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রাচীন রীতির কিছু কিছু ত্যাগ করেছিলেন। ভারতীয় ফৌজের প্রধান একটি অঙ্গ—অর্থাৎ রথারোহী সৈন্যদল তিনি গঠন করেননি। যদিও হর্ষবর্ধনের যুগে অন্যান্য যুদ্ধের সময়ে যে রথ ব্যবহৃত হত তার প্রমাণ আছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় দেখি, একজন ভারতীয় সেনাপতি চার ঘোড়ায় টানা রথে চেপে এক দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন।

এ গেল সপ্তম শতাব্দীর কথা। এরও প্রায় একহাজার বছর আগেকার যবনিকা তুললে দেখা যাবে, গ্রিকদের বিরুদ্ধে রাজা পুরুর রথারোহী সৈন্যেরা যুদ্ধে চলেছে। প্রত্যেক রথে জোড়া চার ঘোড়া এবং প্রত্যেক রথের উপরে রয়েছে যে ছয়জন করে আরোহী, তাদের মধ্যে দুজন হচ্ছে ঢাল—বাহী, দুজন ধনুকধারী এবং দুজন সারথি। শত্রুদের ভিতরে গিয়ে পড়লে, হাতাহাতি যুদ্ধের সময়ে সারথিরাও ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে ধনুর্বাণ নিয়ে লড়াই করে।

এক হাজার বছরের ভিতরে যে দেশে একমাত্র হর্ষবর্ধন (তাও ৭ম শতকে) ছাড়া আর কেউ ফৌজ গঠনে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করেননি, সে দেশে চতুর্থ শতকের যোদ্ধা সমুদ্রগুপ্তও যে ফৌজে প্রাচীন ধারাই বজায় রেখেছিলেন, এটা অনুমান করা কঠিন নয়। অন্তত হর্ষবর্ধনের আগে আর কেউ যে ভিন্নভাবে ভারতীয় ফৌজ গঠন করেছিলেন, এর কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

আলেকজান্ডারের ভারতীয় অভিযান দেখে কিছু কিছু নতুন শিক্ষা পেয়ে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত হয়ত স্বগঠিত ফৌজকে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত করেছিলেন এবং তারপর থেকে খুব সম্ভব মৌর্য ফৌজই ছিল ভারতের আদর্শস্থানীয়। কিন্তু প্রথম ভারত সম্রাট মৌর্য চন্দ্রগুপ্তও চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ফৌজের প্রধান চার অঙ্গই বজায় রেখেছিলেন, যথা—অশ্বারোহী, পদাতিক, হস্তী ও রথ। এবং সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সেনাবিভাগের এই চতুরঙ্গ অবলম্বন করেই প্রত্যেক রাজা করতেন যুদ্ধযাত্রা।

ভারতের অতীত গৌরবের প্রতি সমুদ্রগুপ্তের ছিল অতিশয় অনুরাগ। আর্য সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও দর্শনকে পুনর্বার নবজীবনে পরিপুষ্ট করে তোলবার চেষ্টাই যে ছিল তাঁর জীবনের সাধনা, এর ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই। বুদ্ধদেবের জন্মের আগে ভারতের অবস্থা কী রকম ছিল তার কোনও ঐতিহাসিক ছবি নেই বটে, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের মধ্যে আর্য আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রভৃতির বড়ো অল্প পরিচয় পাওয়া যায় না। সমুদ্রগুপ্ত

সেই আদর্শ, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন অধিকতর সমুজ্জ্বল রূপেই। বৌদ্ধধর্মের আসরে তিনি হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং হিন্দু শিল্প ও সাহিত্যকে করেছিলেন বিদেশি প্রভাব থেকে মুক্ত। তাঁর যুগে পালি ও প্রাকৃতের বদলে দেবভাষা সংস্কৃতই হয়েছিল সাহিত্যের ভাষা। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথা লুপ্ত হয়েছিল বৌদ্ধদের অহিংস ধর্মের মহিমায়।

সমুদ্রগুপ্ত আবার সেই প্রথার পুনঃপ্রচলন করেন। এমন কী তাঁর দ্বিগ্বিজয় যাত্রার মধ্যেও দেখতে পাই রামায়ণ—মহাভারতে কথিত পৌরাণিক দিগ্বিজয়ীদের অনুসরণ। সুতরাং ফৌজ গঠনের সময়েও তিনি যে পুরাতন যুদ্ধশাস্ত্রের নিয়ম মেনেই কাজ করতেন এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহ হবার আর একটা বড়ো কারণ এই যে ফৌজ গঠনে সমুদ্রগুপ্ত নতুন রীতি অবলম্বন করলে পরবর্তী যুগের যোদ্ধারাও পুরাতনকে ছেড়ে এই নতুন ও সফল রীতিই গ্রহণ করত। কিন্তু তা হয়নি। সপ্তম শতাব্দীতেও দেখি, ভারতীয় যুদ্ধক্ষেত্রে ফৌজের প্রাচীন চতুরঙ্গের কোনও অঙ্গের হানি হয়নি।

মৌর্য যুগে ভারতীয় বাহিনী কী ভাবে গঠিত হত তা দেখলেই সকলে সমুদ্রগুপ্তের ফৌজ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করতে পারবেন।

পুরু মোটে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে গ্রিকদের গতিরোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি খুব বড়ো দরের রাজা ছিলেন না, গ্রিকদের সংস্পর্শে না এলে আজ তার নাম পর্যন্ত কেউ জানত না। ভারতে তখনকার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন মগধের মহারাজা নন্দ—যাঁর ভয়ে আলেকজান্ডারকে পর্যন্ত ভারতবিজয় অসমাপ্ত রেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হয়েছিল! গ্রিক ঐতিহাসিক প্লিনি বলেন, নন্দের অধীনে ছিল আশি হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, আট হাজার রথ (প্রত্যেক রথে থাকত সারথি ও দুজন করে যোদ্ধা—সুতরাং আট হাজার রথ মানে চব্বিশ হাজার লোক), ছয় হাজার হাতি (প্রত্যেক হাতির উপরে থাকত মাহুত ও তিনজন করে

ধনুকধারী—সুতরাং ছয় হাতি মানে চব্বিশ হাজার লোক)। অতএব মান বাঁচিয়ে সরে পড়ে আলেকজান্ডার বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মগধ জয় করে এই সৈন্যসংখ্যা আরও ঢের বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তার অধীনে ছিল ছয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, ছত্রিশ হাজার গজারোহী এবং চব্বিশ হাজার রথারোহী—মোট ছয় লক্ষ নব্বই হাজার নিয়মিত সৈন্য!

ভারতের অপেক্ষাকৃত ছোটো অর্থাৎ প্রাদেশিক রাজারাও বেশি লোক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে না পারলে খুশি হতেন না। অনেক কালের কথা নয়, মধ্যযুগেও বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব (১৫০৯—২৯ খ্রিস্টাব্দ) সাত লক্ষ তিন হাজার পদাতিক, বত্রিশ হাজার ছয়শো অশ্বারোহী ও পাঁচশো একান্ন রণহস্তী নিয়ে এক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন! সমুদ্রগুপ্ত বেরিয়েছিলেন প্রায় সমস্ত ভারত জয় করতে। সুতরাং তঁর মতো দিগ্বিজয়ীর অধীনে কত লক্ষ সৈন্য ছিল, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

এই বিরাট ফৌজের তত্ত্বাবধান করা হত কী উপায়ে, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের কার্যবিধি দেখলেই আমরা সেটা ধারণা করতে পারব।

চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বাহিনীকে ছয় বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন। পরিচালনার জন্যে তিনি ত্রিশজন প্রধান কর্মচারি রেখেছিলেন—প্রত্যেক বিভাগে পাঁচজন করে। বিভাগগুলি এই: প্রথম: নৌ বিভাগ। দ্বিতীয়: রসদ বিভাগ। মাল চালান দেবার, দামামাবাহক, সহিস, কারিকর ও ঘেষেড়া প্রভৃতিরও খোরাকের জন্যে ভালো ব্যবস্থা ছিল। তৃতীয়: পদাতিক বিভাগ। চতুর্থ: অশ্বারোহী বিভাগ। পঞ্চম: যুদ্ধরথ বিভাগ। ষষ্ঠ: রণহস্তী বিভাগ।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতীয় ফৌজ চিরকালই পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তীএই চার অঙ্গ নিয়ে গঠিত হত। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিভা এর সঙ্গে অতিরিক্ত আরও দুটি অঙ্গ জুড়ে দিয়েছিল—রসদ ও নৌ বিভাগ। হয়ত গ্রিকদের ফৌজ

পর্যবেক্ষণ করে এই দুটি অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তকেও সমগ্র ভারত জুড়ে সৈন্যচালনা করতে হয়েছিল। রসদের সুব্যবস্থা না থাকলে এটা অসম্ভব হত। যাত্রাপথে পড়ত তাঁর বহু সেতুহীন নদ—নদী। সুতরাং তার নৌ বিভাগও না থাকলে চলত না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, চন্দ্রগুপ্তের দেখাদেখি তিনিও এই দুটি অঙ্গকে পুরাতন চতুরঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যথেচ্ছভাবে বা ভাড়াটে সৈন্য যোগাড় করতেন না। তার প্রত্যেক সৈন্য নিজস্ব, তাদের তিনি নিয়মিত মাহিনা দিতেন। ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, সাজপোশাক ও রসদ—সমস্তই দেওয়া হত রাজভাণ্ডার থেকেই। মধ্যযুগেও ভারতের ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এ প্রথা ছিল না। কারণ সৈনিকরা হত হয় ভাড়াটে, নয় নিজেদের ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, সাজপোশাক সংগ্রহ করত নিজেরাই। অনেক সময়েই তাদের রসদও দেওয়া হত না, তারা যাত্রাপথে যেসব গ্রাম—নগর পড়ত, লুঠ করে পেট ভরাবার ব্যবস্থা করত। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ত্রিশবৎসরব্যাপী ইউরোপীয় যুদ্ধের সময়ে ওদেশে লোকে বলত— যার তরবারি নেই, জামাকাপড় বেচে সে তরবারি কিনুক, তাহলেই সেপাই হতে পারবে!' ওই সময়েই দেখা গিয়েছিল, ব্যাভেরিয়ার ফৌজে লোক আছে এক লক্ষ আশি হাজার, কিন্তু রাজ্যভাণ্ডার রসদ জোগায় মাত্র চল্লিশ হাজার লোকের জন্যে! বাকি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক খাবার যোগাড় করত যথেচ্ছভাবে।—অর্থাৎ চুরি, রাহাজানি, লুণ্ঠপট প্রভৃতির দ্বারা!

চাণক্যের মত ছিল, ফৌজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারি হচ্ছে, রণহস্তীরা। কারণ শত্রুসৈন্য ধ্বংস হয় তাদের দ্বারাই।

প্রত্যেক অশ্বারোহীর কাছে থাকত একখানা করে ঢাল ও দুটি করে বল্লম। পদাতিকের প্রধান অস্ত্র ছিল চওড়া ফলকওয়ালা তরবারি এবং অতিরিক্ত অস্ত্ররূপে তারা সঙ্গে নিত শূল বা ধনুকবাণ। আমরা এখন যেভাবে বাণ ছুড়ে, তারা সেভাবে ছুড়ত না। গ্রিক ঐতিহাসিক এরিয়ান বলেন, "ভারতীয় সৈনিকরা

ধনুকের এক প্রান্ত মাটির উপরে রেখে, বাঁ পায়ের চাপ দিয়ে এমন ভয়ানক জোরে বাণ ত্যাগ করত যে, শত্রুদের ঢাল ও লৌহবর্ম পর্যন্ত কোনও কাজে লাগত না!' বোঝা যাচ্ছে, সেকালের ধনুক হত আকারে রীতিমত বৃহৎ! এতক্ষণে প্রাচীন ভারতীয় ফৌজ সম্বন্ধে পাঠকরা নিশ্চয় অল্পবিস্তর ধারণা করতে পেরেছেন। সমুদ্রগুপ্ত এই ধরনের বাহিনী নিয়েই চতুর্থ শতাব্দীর ভারতবর্ষের দিকে দিকে উড়িয়েছিলেন তাঁর রক্তাক্ত বিজয়পতাকা! তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিমন্ত্রের দ্বারা করতেন বিষ্ণুর উপাসনা! একালের গোঁড়া বৈষ্ণবেরা নিরামিষ খায় জীবহত্যার ভয়ে। এ হচ্ছে কেবল তাদের ভীরুতা, শক্তিহীনতা ও কাপুরুষতা লুকোবার বাজে ওজর! কারণ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর প্রধান উপাস্য যিনি সেই বিষ্ণু কেবল হাতে পদ্ম নিয়ে কমলবিলাসীরূপে পরিচিত নন, অধর্মের কবল থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যে রক্তপাতেও তার যে কিছুমাত্র আপত্তি নেই, ভয়াবহ গদা ও শাণিত সুদর্শন চক্র ধারণ করে সেই সত্যই তিনি প্রকাশ করতে চান।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

হিন্দু ভারত ঐক্য—বাধনে যুক্ত, জয় মহারাজ! জয় সমুদ্রগুপ্ত! তিন বছরে ভারতের তিন হাজার মাইলব্যাপী ভূভাগের উপরে নিজের জয়পতাকা উড়িয়ে দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত আবার ফিরে এলেন মগধরাজ্যে। তার আগে আর কোনও ভারতীয় বীর এমন অসাধ্য সাধন করতে পারেননি।

এ যুগের কাছে সমুদ্রগুপ্তের এই দিগ্বিজয় কাহিনি হয়ত খুব অসাধারণ বলে মনে হবে না। আধুনিক যুদ্ধনায়করা সুনির্মিত রাস্তা, রেলপথ, মটরযান, বাষ্পীয় পোত ও উড়োজাহাজ প্রভৃতির প্রসাদে তিনি হাজার মাইলকে হয়ত বেশি গ্রাহ্য করবেন না। কিন্তু সেকালে এ সবের কিছুই ছিল না। নিরন্ধ্র অরণ্য, উত্তুঙ্গ পর্বত, প্রশস্ত নদ—নদী পার হয়ে বিপুল বাহিনী নিয়ে পদে পদে বিদেশি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্তে ছুটাছুটি করা তখনকার দিনে যে কী অসম্ভব ব্যাপার ছিল, আজকের দিনে আমরা তা ধারণাও করতে পারব না ।

সমুদ্রগুপ্ত বাধা পেয়েছেন বহুবার, কিন্তু কোথাও তিনি পরাজিত হয়েছেন বা পলায়ন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর কোনও দিগ্বিজয়ীর সম্বন্ধেই বোধ হয় একথা বলা যায় না। (আগেই বলেছি, আলেকজান্ডারকেও নন্দ রাজার ভয়ে ভারতজয় কার্য অসমাপ্ত রেখে পৃষ্ঠ—প্রদর্শন করতে হয়েছিল)। এবং এটাই হচ্ছে সমুদ্রগুপ্তের অতুলনীয় যুদ্ধ—প্রতিভার প্রধান প্রমাণ ।

তাকে যে অসংখ্য যুদ্ধ জয় করতে হয়েছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেসব যুদ্ধের কোনও ইতিহাসই আর পাবার উপায় নেই। তবে এলাহাবাদের অশোক—স্তম্ভের উপরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে কবি হরি সেন (ষেণ?) বহু পরাজিত রাজার নাম করেছেন, আমরাও এখানে তাদের উল্লেখ করতে পারি।

আর্যবর্তের বা উত্তর ভারতের অহিছাত্রের অধিপতি অচ্যুত (মহাভারতে উক্ত দ্রুপদ রাজা এই আহিছোত্র রাজত্ব করতেন, সম্প্রতি এর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে), মথুরার রাজা নাগ সেন, পদ্মাবতীর (সিন্ধিয়া রাজ্যের আধুনিক নারওয়ার শহরের কাছে) রাজা গণপতি নাগ এবং রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, নদী, বলবর্মা ও চন্দ্রবর্মা প্রভৃতি।

কথিত আছে, রাজা প্রবর সেনের পক্ষ অবলম্বন করে মথুরা। পদ্মাবতী ও অহিছাত্রের রাজারা এলাহাবাদের কাছে একসঙ্গে সমুদ্রগুপ্তকে আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। এতগুলি রাজার বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়িয়ে সমুদ্রগুপ্ত জয়মাল্য অর্জন করেছিলেন, এও তার সাহস ও যুদ্ধ—প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

উপরে সর্বশেষে যে চন্দ্রবর্মার নাম করা হয়েছে, তার সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। তিনি উত্তর ভারতের এক অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। রাজপুতানার মরুপ্রদেশে পুষ্করণ নামক স্থানে তিনি রাজত্ব করতেন। দিল্লির লৌহ স্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলালিপি পড়ে জানা গিয়েছে, সমুদ্রগুপ্তের অভ্যুত্থানের কিছু আগেই তিনি বাংলা থেকে বাহিক দেশ পর্যন্ত—অর্থাৎ সমস্ত আর্যবর্ত নিজের দখলে এনেছিলেন। কিন্তু এত বড়ো শক্তিশালী রাজাকেও সমুদ্রগুপ্তের সামনে পরাজয় স্বীকার ও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

উত্তরাপথ দখল করবার পর সমুদ্রগুপ্ত অগ্রসর হলেন দক্ষিণাপথে। এদিকে সমুদ্রগুপ্তের কাছে যারা হেরে গিয়েছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম ১। দক্ষিণ কৌশলের রাজা মহেন্দ্র, ২। মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ, ৩। কৌরলদেশের রাজা মণ্টরাজ, ৪। কোষ্ট্রর ও পিষ্টপুরের (আধুনিক পিট্টপুরম) রাজা স্বামীদত্ত, ৫। এরণ্ডপল্লের রাজা দমন, ৬। কাঞ্চির রাজা বিষ্ণু গোপ, ৭। অবমুক্তের রাজা নীলরাজা, ৮। বেঙ্গীনগরের রাজা হস্তিবর্মা, ৯। পলক্কের (সম্ভবত

নেলোর জেলায়) রাজা উগ্রসেন, ১০ । দেবরাষ্ট্রের (আধুনিক মহারাষ্ট্রের) রাজা কুবের, ১১। কুস্থলপুরের (খন্দেশের) রাজা ধনঞ্জয় প্রভৃতি।

সমুদ্রগুপ্তের কাছে মাথা নত করে কর দিত। এই সব জাতি বা রাজ্য: ১। সমতট (যা দক্ষিণ থেকে পূবর্বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত), ২। ডবাক (বোধ হয় ঢাকার পূর্ব নাম), ৩। কামরূপ, ৪। নেপাল, ৫। কর্তৃপুর (আধুনিক কুমায়ুন ও গাড়োয়াল), ৬। আজুনিয়ন, ৭ । যৌধেয়, ৮। মদ্রক (পাঞ্জাব), ৯। আভীর, ১০। সনকানীক (মালব), ১১। কাক, ১২। খরপরিক। তখনকার ভারতে যেসব রাজা সবচেয়ে বিখ্যাত ও পরাক্রমশালী ছিলেন, সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে নিশ্চয়ই কেবলমাত্র তাদেরই নাম স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া তার দিগ্বিজয়ের নেশার মধ্যে যে আরও কত রাজার প্রাণ ও রাজ্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সে হিসাব দেওয়া সম্ভব নয় ।

শত শত রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য ভারে ভারে এসে মগধের রাজভাণ্ডারকে করে তুললে যক্ষপতি কুবেরের রত্নভাণ্ডারের মতো। জনবলে, অর্থবলে ও অপূর্ব খ্যাতিতে মগধের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, ভারতবর্ষে এমন রাজ্য আর দ্বিতীয় রইল না। প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের তিরোধানের পরে মহানগর পাটলিপুত্র কেবল পূর্বগৌরব থেকেই বঞ্চিত হয়নি, তার জীবনীশক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসছিল ক্রমশ। সমুদ্রগুপ্তের শৌর্যবীর্য আবার তাকে করে তুললে নবযৌবনে বলীয়ান, বিচিত্র মহিমায় মহীয়ান।

ভারতের সীমান্তে ও আশেপাশের রাজ্যাধিকারীরা সমুদ্রগুপ্তের তরবারির সঙ্গে পরিচিত না হয়েও সসম্ভ্রমে উপলব্ধি করলেন যে বহুকাল পরে হিন্দুস্থানে আবার এমন এক বৃহৎ জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েছে, যাকে আর মাথা নামিয়ে স্বীকার না করে উপায় নেই। এর সঙ্গে শত্রুতা করলে মৃত্যু অনিবার্য, মিত্রতা রাখতে পারা গর্ব ও সৌভাগ্যের বিষয়। গ্রিক, পারসি, ও অন্যান্য জাতীয় বৈদেশিক দাসুযরা দুর্বলতার সুযোগ পেলেই ভারতকে লুণ্ঠন করবার জন্যে ছুটে আসত

সংগ্রহে, তারা এখন আর আর্যাবর্তের দিকে ফিরে তাকাতেও ভরসা করল না। নিরাপদ হবার জন্যে কাবুলের কুষাণ রাজা সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

এই সময়ে (৩৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি) সুদূর সিংহল থেকে দুজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এলেন বুদ্ধগয়ায় তীর্থ করতে। সমুদ্রগুপ্তের উৎসাহে নবজাগ্রত হিন্দুত্বের প্রাথমিক উত্তেজনায় মগধের প্রজারা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উচিত মতো আদর করেনি, সম্মান দেখায়নি। সন্ন্যাসীরা নানা অসুবিধা ভোগ করে দেশে ফিরে গিয়ে সিংহলের রাজা শ্রীমেঘবর্ণের কাছে সব কথা জানালেন। মেঘবর্ণ তখনই সমুদ্রগুপ্তের কাছে বহুমূল্য উপহার পাঠিয়ে সিংহলি বৌদ্ধদের জন্যে বুদ্ধগয়ায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

বলেছি, হিন্দু ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জাগিয়ে তোলাই ছিল সমুদ্রগুপ্তের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তিনি নিজেও ছিলেন বিষ্ণুর পূজক। কিন্তু তীরও কয়েক শতাব্দী আগে শেষ মৌর্য রাজাকে হত্যা করে সেনাপতি পুষ্যমিত্র যেমন মগধের সিংহাসনে হিন্দুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্যে অগুন্তি বৌদ্ধ মঠ—মন্দির ভেঙে হাজার হাজার বৌদ্ধকে তরবারির মুখে সমর্পণ করেছিলেন, সমুদ্রগুপ্ত তেমন হিংসুক হিন্দু ছিলেন না। তঁর মন ছিল পরম উদার, তাই বৌদ্ধ না হয়েও বৌদ্ধ বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হননি। সুতরাং তিনি সানন্দেই বুদ্ধগয়ার নতুন মঠ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সিংহলপতির কাছে নিজের সম্মতি জানালেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে রোম ও চিন সাম্রাজ্যের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

কিন্তু তিনি পিতার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেননি। দ্বিগ্বিজয়ের কর্তব্য সমাপ্ত, কিন্তু এখনও অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হয়নি।

বহু শতাব্দী আগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্যের জন্যে ভারত থেকে অশ্বমেধের প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ ঐ দুই ধর্মে জীবহিংসা নিষিদ্ধ।

তারপর পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার অশ্বমেধের বৈদিক অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু সেও পাঁচ শতাব্দীরও বেশি আগেকার কথা।

এরই মধ্যে কুষাণ সম্রাটদের যুগে বৌদ্ধধর্ম আবার মাথা তোলবার অবসর পায়। তারপর ভারতে আসে অন্ধযুগ এবং আর্যবর্ত হয়ে যায় খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। সে সময়ে হিন্দু রাজার অভাব ছিল না বটে—কিন্তু তাঁদের কারুর অশ্বমেধের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবার শক্তি ও সাহস ছিল না। কারণ যিনি মহাশক্তিমান সার্বভৌম সম্রাট নন, তাঁর পক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞের দুরাশা করা বামনের চাঁদ ধরবার দুশ্চেষ্টা করার মতো হাস্যকর।

অশ্বমেধ বিধি হচ্ছে এই: একটি বিশেষ লক্ষণযুক্ত ঘোড়াকে মন্ত্রপূত করে তার মাথায় জয়পত্র বেঁধে নানা দেশে বেড়াবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হত—তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত বহু সশস্ত্র রক্ষক। রাজা বা তার প্রতিনিধিও সঙ্গে যেতেন। ঘোড়া কোনও বিদেশি রাজার রাজ্যে ঢুকলে তাঁকে হয় যুদ্ধ করতে, নয় বশ মানতে হত। এক বৎসর ধরে ঘোড়ার সঙ্গে এই যাত্রা চলত। যে যে দেশের ভিতর দিয়ে ঘোড়া অগ্রসর হত তার প্রত্যেকটিরই রাজা যদি অধীনতা স্বীকার করতেন, তাহলে ঘোড়ার মালিক দিগ্বিজয়ী বীরের মতো বশীভুত রাজাদের সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসতেন। কোনও স্থানে পরাজিত হলে লোকে তাকে উপহাস করত, সার্বভৌম সম্রাট বলে মানত না এবং তিনি যজ্ঞাধিকারীও হতে পারতেন না। সফল হয়ে ফিরে এলে পর চৈত্র পূর্ণিমায় খুব ঘটা করে যজ্ঞ আরম্ভ হত। ঘোড়াকে দেওয়া হত বলি। ঘোড়ার বুকের চর্বিতে হত যজ্ঞাগ্নির সংস্কার এবং তার দেহের মাংস পুড়িয়ে করা হত হোম। যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠাতা উপবাস করে থাকতেন এবং রাত্রে তাকে সস্ত্রীক শয্যাহীন মাটির উপরে শুয়ে ঘুমোতে হত।

নির্বিঘ্নে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করে সমুদ্রগুপ্ত প্রমাণিত করলেন যে তিনিই হচ্ছেন ভারতের একছত্র সম্রাট, এখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন এমন আর কেউ নেই।

কথিত আছে, এই যজ্ঞ উপলক্ষে ভারতব্যাপী গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে মহোৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং মহারানি দত্তাদেবীকে নিয়ে মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত যে যজ্ঞের প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করেছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণরা দান পেয়েছিল কোটি কোটি মুদ্রা।

দক্ষিণা দেবার জন্যে, সমুদ্রগুপ্ত নতুন রকমের স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করিয়েছিলেন। তার এক পিঠে আছে যজ্ঞযুপে বাঁধা বলির ঘোড়ার মূর্তি, অন্য পিঠে সমুদ্রগুপ্তের মহারানির মূর্তি। এই দুপ্রাপ্য মুদ্রার একটি নমুনা কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। সমুদ্রগুপ্তের হুকুমে গড়া তীর অশ্বমেধের ঘোড়ার একটি পাথরের মূর্তিও হিমালয়ের তলায় বনের ভিতরে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি আছে লক্ষ্ণৌ—এর যাদুঘরে।

কবি হরিসেন শিলাপটে সমুদ্রগুপ্তের যে সমুজ্জ্বল শব্দচিত্র এঁকে গেছেন তাতে দেখি যে তিনি একাধারে দিগ্বিজয়ী সম্রাট, গীতবাদ্যে প্রথম শ্রেণির শিল্পী এবং কাব্যরাজ্যেও শ্রেষ্ঠ কবির সমকক্ষ।

দিগ্বিজয়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পরও অধিকাংশ দিগ্বিজয়ীর রক্ত নেশা পরিতৃপ্ত হয় না এবং অনেক দিগ্বিজয়ীই অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করেছেন রক্তাক্ত তরবারি হাতে করেই। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত এ—শ্রেণির যুদ্ধপাগল বীর ছিলেন না। যুদ্ধপর্ব যখন সমাপ্ত হল, তখন তিনি একাগ্র চিত্তে নানাদিকে নানা সুব্যবস্থা করে নিজের সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করে তোলবার চেষ্টায় নিযুক্ত হলেন। এত যত্নে প্রজাপালন করতে লাগলেন যে তার রাজ্য হয়ে উঠল। রামরাজ্যের মতো। তার শক্তি ও বীরত্ব দেখে যারা মনে মনে তাকে মানত না তারাও ভয়ে হয়ে পড়েছিল বিষহারা নতফণা সর্পের মতো। কঠিন ও দৃঢ় হস্ত রাজদণ্ড ধারণ করে আছে

দেখে দাসু, চোর ও অসাধুদের দল গেল ভেঙে। এইসব কারণে প্রজাদের সুখের সীমা ছিল না—তারা যাপন করত শান্তিময় জীবন। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই চৈনিক ভ্রমণকারী ফা হিয়েন গুপ্তসাম্রাজ্যে এসে দেখেছেন, এখানে গুরুতর অপরাধের সংখ্যা এত কম যে প্রাণদণ্ড দেবার কথা লোকের মনেই পড়ত না এবং রাজ্যের কোথাও ছিল না। দস্যুতার উপদ্রব।

কিন্তু কেবল রাজনীতি নিয়েই তিনি মেতে থাকতেন না। কেবল গীত—বাদ্য—কাব্যই তার অবলম্বন ছিল না। হরিসেন বলেন, বিদ্বজ্জন সমাজের মধ্যে থাকতে পারলে সমুদ্রগুপ্ত অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। শাস্ত্রালোচনার সুযোগ তিনি ছাড়তেন না।

সব দিক দিয়ে হিন্দুর লুপ্ত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে সমুদ্রগুপ্ত প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করেননি। গ্রিক ও পারসিদের প্রাদুর্ভাবের জন্যে ভারতের শিল্পে ও সাহিত্যে বিদেশি প্রভাব ক্রমেই বেড়ে উঠেছিল, সমুদ্রগুপ্ত দিলেন সেই প্রভাব লুপ্ত করে। কবি, নাট্যকার ও শিল্পীদের ঘুমন্ত দৃষ্টিকে জাগিয়ে তুলে তাদের সামনে দেশের দর্পণ ধরে তিনি বললেন'একবার নিজেদের মুখের পানে তাকিয়ে দ্যাখো। তোমরা হচ্ছে সুন্দরের বংশধর, নিজেরাও পরমসুন্দর!। সমুদ্রগুপ্তেরই সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অন্ধযুগের অত্যাচারিত, জীবন্মুত ভারত আবার শক্তিধর হয়ে জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে লাভ করল ধ্রুবদ্যুষ্টি—দেখতে পেল আপনি আত্মার ঐশ্বর্য। পিতৃদত্ত শিক্ষার গুণে বিখ্যাত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা কাব্যে প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য মহাভারতের যে বিচিত্র মানস—প্রতিমা সম্পূর্ণ করে বিশ্বের বিস্মিত চোখের সামনে তুলে ধরেন, তার অপূর্বকাঠামো গড়ে গিয়েছিলেন সমুদ্রগুপ্তই স্বহস্তে। সেই বহু বাহুধারিণী দেবীমূর্তির হাতে কেবল শত্রুঞ্জয় নানা প্রহরণই ছিল না, ছিল বেদ, উপনিষদ, নব নব পুরাণ—ছিল দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা—ছিল কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য—ছিল গীত—বাদ্য—নৃত্য ও অভিনয়ের প্রতীক—ছিল চিত্র—ভাস্কর্য—স্থাপত্য প্রভৃতি বিবিধ ললিতকলার

নিদর্শন এবং সেই সঙ্গে পরিপূর্ণ ধনধান্যের পসরা! রামায়ণ—মহাভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ কবিদের কল্পনা—কুহেলিকায় রহস্যময় বলে মনে হয়—তার ভিতর থেকে নিশ্চিতভাবে কিছুই আবিষ্কার করবার উপায় নেই। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের ধ্যানের মন্ত্র হিন্দু ভারতের যে মহিমময় মূর্তিকে সাকার করল, ঐতিহাসিক কালের আগে ও পরে তার সঙ্গে তুলনীয় আর কিছুই দেখা যায় না। পুত্র বিক্রমাদিত্য ও পৌত্র কুমারগুপ্ত উত্তরসাধক হয়ে সমুদ্রগুপ্তেরই সাধনাকে অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলেন—তারা ছিলেন সমুদ্রগুপ্তেরই প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অনুসারী।

সমুদ্রগুপ্ত অক্ষরে অক্ষরে পিতৃসত্য পালন করলেন। দিগ্বিজয়ের দ্বারা খণ্ড খণ্ড ভারতকে সংযুক্ত করে স্থাপন করলেন এক অখণ্ড ও বিরাট সাম্রাজ্য এবং বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের সংস্কৃতি—প্রাচীন হিন্দুধর্ম হল আবার নবীন যুবকের মতো।

এই সকল সাধনার আশ্চর্য পরিকল্পনার মধ্যে কোথায় ডুবে যাবে আমাদের মতো ক্ষুদ্র গল্প—লিখিয়ের কাল্পনিক কাহিনির সূত্র—মহাসাগরে সাঁতারুর সৃষ্ট অস্থায়ী জলের মতো। এরপর গালগল্প চলে না। তাই সমুদ্রগুপ্তের নিপুণ হাতের বীণাবাদন শোনবার জন্যে তাঁর রানি দত্তাদেবী আর সখি পদ্মাবতীকে আর আমন্ত্রণ করতে পারলুম না।